কান্তিধারা

সুবোধ ঘোষ

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সিংহ
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১ মোহনবাগান লেন
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :
এস. স্কোয়ার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশক :
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম : তিন টাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই :

ত্রিযামা

সুজাতা

ভারত প্রেমকথা

কিংবদন্তীর দেশে

শতকিয়া

ফসিল

শুন বরনারী

শ্রেয়সী

নাগলতা

অনেকেই বলছেন, হুড্রুর জলে এবার যেন একটু বেশি ফুর্তি দেখা যাচ্ছে।

যাঁরা ক্যামেরা হাতে ছুলিয়ে বেড়াচ্ছেন আর ফটো তুলছেন তাঁরাও বলছেন, ঠিকই, গত বছর এদিকের পাথরের চটানটাকে একেবারে শুকনো খটখটে দেখেছিলাম। এবার দেখছি শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, এদিকে এরকম ছুটো ধারাও ছিল না।

শ্রাবণের হুড্রুর সেই রুদ্রভৈরব রূপ অনেকেই দেখেননি ; কিন্তু শীতের হুড্রুকে অনেকেই দেখেছেন, এবং, কোনো সন্দেহও নেই, গত শীতের হুড্রুর চেয়ে এবারের শীতের হুড্রু যেন একটু বেশি মত্ত। জলের জটাগুলি যেন একটু বেশি ফুলে আর ফেঁপে উঠেছে।

এর কলনাদও যেন একটা তরল গর্জন ; বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই গর্জন আবার যেন ঝড়ো হাহাকারের মত শব্দ করে বনের বুক একটু বেশি উতলা করে দিচ্ছে। এত জলের তোড় গত শীতের হুড্রুতে দেখতে পাওয়া যায়নি। আছড়ে পড়া জলের ফেনাও যেন একটু বেশি সাদা হয়ে হাসছে। গত শীতের হুড্রুর জলের ফেনাতে একটু কাদাটে ভাব ছিল।

গত বর্ষাতে হুড্রুর জল যেন একটু বেশি পাগলও হয়েছিল, তার প্রমাণও দেখতে পাওয়া যায়। যে বলাই মাস্টার তাঁর স্কুলের ছাত্র-দলকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকে এসেছেন, তিনিই সবার আগে আশ্চর্য হয়ে বললেন—এখানে যে চমৎকার ছুটো পিয়াল ছিল। কত কুঁড়ি ধরেছিল গাছ ছুটোতে। কিন্তু কই ? আজ এখানে শুধু যত নুড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে।

কোন সন্দেহ নেই, সেই কুঁড়িধরা পিয়াল ছুটোকে গত বর্ষার হুড্রু ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

আর একটা পিকনিক পার্টি, যাদের মধ্যে চারজন তরুণী ছাড়া আর কেউ নেই, তাদেরই একজন খুশি হয়ে আর ব্যস্তভাবে বলে— চল চল, আমরা আর-একটু দূরে গিয়ে, ঐ ওখানে, যেখানে এক গাদা জংলী কসমস ফুটে রয়েছে, সেখানে জায়গা দখল করি। নইলে···।

নইলে সত্যিই অন্য একটা পার্টি জায়গাটাকে দখল করে নেবে। পরিষ্কার আর প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর শুধু তার চওড়া পিঠটুকু মাটির উপর ভাসিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। তার চারদিকে আবার কসমসের জঙ্গল রঙীন হয়ে হাসছে। প্রকাণ্ড তিনটে শিশুগাছের ছায়াও সেখানে আছে। পিকনিকের ঠাঁই হিসাবে এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর কি হতে পারে?

তরুণীদের পার্টিটা যেন একটা খুশির হাসির কলরোল তুলে কালো পাথরটার দিকে দৌড় দেয়।

কেদারবাবু, যিনি কম্ফর্টার দিয়ে মাথা আর দু'কান জড়িয়ে নিয়ে, আর স্ত্রী ও চারটি ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পিকনিকের জায়গা খুঁজছিলেন, তিনি এই তরুণী-দলের দিকে তাকিয়ে যেন একটা ভ্রুকুটি চাপতে চেষ্টা করেই বিড়বিড় করে বলেন—এরা কলকাতা থেকে এসেছে মনে হচ্ছে। গত বছর তো একরকম কোন স্বাধীন জেনানার দলকে এখানে দেখিনি।

সত্যিই, এবার পিকনিকের ভিড় একটু বেশি বলে মনে হয়। আমলকীর জঙ্গলের ওপাশে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, ওখানে একটা ফুর্তির আসর এরই মধ্যে জমে উঠেছে। এখন তো মাত্র সকাল নটা। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে শীতের কুয়াশা সরেছে আর কাঁচা রোদের আভা লেগে হুড্রুর জলের একটা ধারা একেবারে কাঁচা সোনার ধারা হয়ে গিয়েছে।

এ বছর বিলিতী টুরিস্টের আবির্ভাবও একটু বেশি হয়েছে বলে মনে হয়। কেদারবাবুর পারিবারিক পার্টির দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে এক সাহেব ও এক মেম এগিয়ে গেলেন। কেদারবাবু

বলেন—এরা লোক ভাল। এরা শুধু ঝর্ণার শোভা দেখে আর ফটো তুলেই চলে যায়। আর ওরা…।

কেদারবাবু সেই তরুণীদলের দিকে লক্ষ্য করে কি-যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী হাসেন—তুমি ওদের ওপর এত বেশি চটে গেলে কেন ?

কেদারবাবু—ওরা এখানে আসে শুধু খেতে। গামলা ভরে চপ খাবে, কব্জি ডুবিয়ে মাংস খাবে। সিঙ্গাড়া-সন্দেশ-কলা-পেয়ারা-তেলেভাজা সব খাবে। আমি এই দশ বছর ধরে এখানে পিকনিকে এসে এই কীর্তিই তো দেখে আসছি।

কেদারবাবুর স্ত্রী আবার হাসেন—বেচারাদের খাওয়ার ওপর তোমার হিংসে কেন ?

কেদারবাবু—একটুও হিংসে নয়। আমার ডিসপেপসিয়া আছে বলেই যে ওদের খাওয়ার ঘটা দেখতে আমার খারাপ লাগে, তোমার এই সন্দেহ ঠিক নয়। কথাটা হলো, ওরা হুড্রু দেখবার ছুতো করে এত খাবে কেন ? খাওয়াটাই যখন লক্ষ্য, তখন বাড়িতে বসেই অগস্ত্যের মত মাংসের ঝোলের সমুদ্দুর শুষে ফেলুক, আমার আপত্তি নেই।

—আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।

চমৎকার একটা মিষ্টি স্বরের গান যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। কেদারবাবু চমকে উঠে আবার তরুণীদের দলটার দিকে তাকালেন। কালো পাথরটার উপর বসে আর হুড্রুর রোদের আভায় সোনা হয়ে যাওয়া ধারাটার দিকে তাকিয়ে ঐ চারটি মেয়েই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছে।

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—ঐ তো জলের ধারার দিকে তাকিয়ে কত খুশি হয়ে গান গাইছে ওরা। মানুষকে তোমার একটু বেশি নিন্দে করা অভ্যেস।

কেদারবাবু—তোমারও মানুষকে একটু বেশি বিশ্বাস করা অভ্যেস। চোখ থাকলে আমার সঙ্গে এত তর্ক করতে না।

কেদারবাবুর স্ত্রী—চোখ আছে বলেই তো দেখতে পাচ্ছি; মেয়েগুলো খুশি হয়ে বসে ঝর্ণার শোভা দেখছে।

কেদারবাবু—আর, ঐ যে, ওগুলো কী?

—কী?

—ঐ যে ওদের এপাশে আর ওপাশে চারটে ধাড়ি-ধাড়ি টিফিন-কেরিয়ার আর চারটে ঝোলা। ওগুলোর ভেতরে বুঝি গাদা গাদা বকুলফুল আছে? মালা গাঁথতে এসেছে ওরা?

—জানি না। আমার কথা হলো, ওদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথার দরকার কি?

—না, কোন দরকার নেই। কেদারবাবু আস্তে একটা হাঁফ ছাড়েন।

এ বছরের শীতে, নতুন বছরের এই প্রথম দিনটিতে হুড্রুর জলপ্রপাতের আশে-পাশে পিকনিক করতে যারা এসেছে, তাদের অনেকেই কেদারবাবুর মত রাঁচি শহরের এ-পাড়ার আর ও-পাড়ার মানুষ; অনেকেই একেবারে দূরের কোন শহরের মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার মানুষ।

অনেকেই রান্না-করা খাবারের নানা রকমের বোঝা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। অনেকে আবার রান্নার সব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে; ঝুড়িভরা কপি, হাঁড়িভরা মিষ্টি, টিনভরা ঘি আর বস্তাবন্দী চাল-ডাল নিয়ে এসেছেন। এঁদের ইচ্ছাটা, রান্না-বান্নারই একটা মহোৎসব ঘটিয়ে ভুরিভোজনের আনন্দ গ্রহণ করবেন।

কেদারবাবুর ক্ষোভের সবটাই অহেতুক বলা যায় না। সত্যিই দেখা গেল, সংখ্যায় দশ-বারোজন হবে, একটি বাঙালী পরিবার এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনের মত জায়গা খুঁজছে। দুটো চাকরের মাথায় আর কাঁধের উপর নানা রকমের খাদ্য-সম্ভারের

বোঝা চাপানো ; সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্যান্ত পাঁঠা চলেছে ; এক ভদ্রলোক দড়ি ধরে পাঁঠাটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ ট্যাক্সির চার্জ চারগুণ, বাস রিজার্ভের দর তিনগুণ। কিন্তু সে জন্যে হুড্রুর আহ্বান মিথ্যে হয়ে যায়নি। অনেক পার্টি এসেছে। অনেক দম্পতি এসেছে। কিন্তু একা ? না, কেউ নয়। একা পিকনিক যে পিকনিকই নয়।

আবার চমকে উঠলেন কেদারবাবু—কি আশ্চর্য !

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—কি হলো ?

—এই দশ বছরের মধ্যে যা দেখিনি, তাই এবার দেখতে হচ্ছে।

—কি দেখতে পেলে ?

—ঐ দেখ। এক ভদ্রলোক একাই পিকনিকে এসেছেন।

ভদ্রলোক ঠিকই, কিন্তু অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক। দেখতে ধবধবে ফর্সা। রোগা নয় ; কিন্তু বেশ লম্বা বলেই বোধহয় রোগাটে বলে মনে হয়। ভুরু দুটো একটু বেশি ঘন আর বেশি কালো। ভদ্রলোকের হাতে মস্ত বড় একটা ঝোলা, আর কাঁধের সঙ্গেও ছোট একটা ঝোলা দুলছে।

ভদ্রলোক এদিকে আর এগিয়ে না এসে ওদিকেই ফিরে গেলেন। কোন্ দিকে গেলেন কে জানে ? মনে হলো, যেন গানের শব্দটা শুনেই একটু আশ্চর্য হয়ে অন্য দিকে সরে গেলেন।

এবারের নতুন বছরের প্রথম দিনে হুড্রুর শোভার রাজ্যে পিকনিক করতে এসে যে দুটো নতুন কাণ্ড দেখলেন কেদারবাবু, সে দুটো নতুন কাণ্ডই বটে। সঙ্গে কোন পুরুষ নেই, চারটে বয়স্ক মেয়ে দল বেঁধে পিকনিক করতে এসেছে, এরকম ব্যাপার আগে কখনো দেখা যায়নি। তাছাড়া, ঐ ভদ্রলোকের মত, একটা একলা যোগীর মত কেউ এখানে কোনদিন পিকনিক করতে এসেছে, এমন ঘটনা এই দশ বছরেও কেদারবাবুর চোখে কখনো পড়েনি।

—আমাদের সঙ্গে কি কি আছে? কেদারবাবু গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—মিল্ক অব্ ম্যাগনেশিয়া আছে।

কেদারবাবু—না না, ঠাট্টার কথা নয়। তুমি তো জান, হুড্রুর জল পেটে পড়লে আমার কি ভয়ানক ক্ষিদে হয়।

শ্যামা আর রমা বলে—মুর্গীর মাংস আছে, বাবা।

পরেশ আর নরেশ বলে—সরু চালও আনা হয়েছে।

কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—ক্ষীরের সন্দেশও আছে। নিশ্চিন্তি হলে তো?

কেদারবাবু—না না, ঠাট্টার কথা নয়। হুড্রুর জলের মত হজমী জল ভূভারতে কোথাও নেই। যাক্…ভুলে যাওনি তাহলে।

ওখানে, কসমসের জঙ্গলের কাছে কালো পাথরের চটানের উপর চারটে খুশির ছবির মত বসে যারা পর পর তিনটে গান গেয়েছে, তাদের পরিচয় এতক্ষণে জানতে পেরেছেন কেদারবাবু। শ্যামা আর রমা ওদেরই হাতছানি দেখে ওদের কাছে গিয়েছিল। শ্যামাকে আর রমাকে ওরা কমলালেবু খেতে দিয়েছে; আর অনেক গল্পও করেছে।

ওরা হলো কলকাতার একটা মেয়ে-স্কুলের চার দিদিমণি।

রমা বলে—শুধু শীলাদি ছাড়া আর সবাই খুব সুন্দর, চমৎকার।

শ্যামা বলে—সবচেয়ে সুন্দর রেবাদি।

রমা—ককৃখনো না। ফার্স্ট সুন্দর হলো নীহারদি, সেকেণ্ড জয়াদি, থার্ড রেবাদি।

কেদারবাবু—ওদের সঙ্গে খাবার-টাবার কিরকম দেখলি?

শ্যামা—কিছ্ছু না। শুধু কয়েকটা শুকনো পাঁউরুটি, চিনি, কমলালেবু আর মটরশুঁটির ঘুগনি।

—তবে অত বড় বড় ঝোলাতে আর টিফিন কেরিয়ারে কী নিয়ে এসেছে ওরা ?

রমা বলে—ঝোলাতে শুধু জামা-কাপড় আর বই আছে। আর টিফিন কেরিয়ারে ঐ পাঁউরুটি চিনি···।

কেদারবাবু—বাস্ ; শুধু ঝন্ঝন্ ঠন্ঠন্ ?

রমা—আর কিছু নেই।

কেদারবাবু—কেন ?

রমা—কে জানে কেন ? সবাই একসঙ্গে কলকাতা থেকে আজ সকালে রাঁচিতে এসেছেন, আবার আজই রাতের ট্রেনে চলে যাবেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী আবার মুখ টিপে হাসতে শুরু করেছিলেন বলেই কেদারবাবু দুঃখিতভাবে হাসতে থাকেন।—না, সত্যিই মেয়ে-গুলোকে ভাল বলেই মনে হচ্ছে। বুঝছ না, শুধু হুড্রু দেখবার জন্যেই এতদূরে ছুটে আসা, এটা চারটিখানি শখের ব্যাপার নয়। কিন্তু···

শ্যামার মা—কি ?

কেদারবাবু—তুমি এক ফাঁকে গিয়ে ওদের একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কথাটা বলে দিও।

—কি বলবো ?

কলকাতা থেকে সবে মাত্র এসেছে। ফুর্তির মাথায় হয়তো এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করবে ; খাড়াই পাথরের গায়ে উঠবে কিংবা জলে নামবে···তুমি ওদের জানিয়ে দিয়ে এসো, যেন ভুল করে এমন সাহস না করে।

—কেন ?

—তুমি কি জান না ? কখনো কি শোন নি ?

—না।

—আমি জানি বলেই বলছি। হুড্রুর জল কিন্তু প্রতি বছর অন্তত একটি বলি আদায় না করে ছাড়ে না।

—বলি ?

—হ্যাঁ। মানুষের প্রাণবলি। থানার লোককে জিজ্ঞাসা করলেও ওরা ঠিক এই কথাই বলবে। কে জানে, ছায়া-ছায়া কি-যেন একটা এখানে ঘুরে বেড়ায়। গাইডরাও জানে ; ওরাও কেউ কেউ দেখেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে ওরা এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না।

—সেটা জানোয়ারের ভয়ে।

—জানোয়ারের ভয় ওরা করে না। আসল ভয় হলো, সেই ছায়া-ছায়া আত্মাটার ভয়। যাই হোক, কুসংস্কার মনে কর আর যা-ই কর, মেয়েগুলোকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।

আর একটা দল। তু'জন বাঙালী সাহেব আর তু'জন বাঙালী মহিলা, যাঁদের দেখলে বাঙালী মেম বলেই মনে করতে হয়। একজন সাহেবের হাতে রাইফেল, আর একজনের হাতে বাইনকুলার। তুই মহিলার হাতে তুটি ভ্যানিটি ব্যাগ। দলটা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে আর কেদারবাবুর পারিবারিক দলটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। রাইফেল-সাহেব বাংলাতেই বলেন—না না, এরা তো আমাদের কুলিদল নয়।

বাইনকুলার-সাহেব বলেন—তবে কোথায় গেল ওরা ?

—ডাউন স্ট্রিমের এরকম একটা বাজে জায়গায় তাঁবু ফেলার কথা তো নয়।

বাইনকুলার-সাহেব এইবার হাতের বাইনকুলার চোখের কাছে তুলে আপ-স্ট্রীমের দিকে তাকান। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—ঐ যে, ঐ উঁচুতে একটা ইউক্যালিপটাসের কাছে তাঁবু দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় আমাদের তাঁবু।

দলটা চলে যেতেই কেদারবাবু যেন বিরক্ত হয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন।—হুঁঃ।

কেদারবাবুর স্ত্রী—কি হলো ? ওদের ওপর আবার কিসের রাগ ?

কেদারবাবু—আমি ভেবে পাই না, লোকগুলো এখানে কোন্ সাহসে রাইফেল সঙ্গে নিয়ে আসে। হুড্রুর জল দেখতে এসেছিস, দেখে চলে যা! রাইফেলের দরকারটাই বা কি?

—শিকার-টিকার করতে চায় বোধহয়।

—সেই জন্যেই তো বলছি। শিকার বলতে তো কাঁচকলা! যেন হাতি গণ্ডার আর বাঘ এখানে থৈ-থৈ করছে। দু'হাজার টাকা দামের রাইফেল কাঁধে নিয়ে যত ফড়িং-বীর এখানে শিকারী-পনা দেখাতে এসেছেন।

কেদারবাবুর স্ত্রী এরই মধ্যে তিনটে বড় নুড়ি জড় করে পিকনিকের উনুন তৈরি করে ফেলেছেন। পরেশ আর নরেশ মরা বনকুলের শুকনো একটা ঝোপ উপড়ে নিয়ে এসেছে। শুকনো কুলের ঝুরি উনুনে ঠেসে দিয়ে আর আগুন ধরিয়ে দিয়েই কেদারবাবুর স্ত্রী বলেন—তুমি কি এক বাটি চা খেয়ে নেবে?

কেদারবাবু গরগর করেন—যা না, সোঁদরবনে যা, কালাহাণ্ডি যা, রাইফেলের দাপট দেখাতে এখানে আসিস কেন?

হেসে ফেলেন কেদারবাবুর স্ত্রী—তুমি দেখছি এখনও ওদের ছেড়ে দিতে পারনি।

—ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ইচ্ছে করছে ওদেরও একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আসি।

—কি বোঝাবে?

—যেন ভুল করে ঐ হরতকী জঙ্গলের হরয়াল ঘুঘুর উপর গুলি-টুলি না ছোঁড়ে।

—কেন?

—ছুঁড়লেই ঠেলা বুঝবে।

—কেন?

—ওরা জানে না, হুড্রুর হরতকী জঙ্গলের ঘুঘুকে মারলেও খেতে পারবে না। সে ঘুঘুর মাংস তেতো বিষ হয়ে যাবে।

—কে বললে ?

—আমি বলছি। গাইডরাও বলবে। যারা এখানে পাঁচ-দশবার এসেছে, তারাও বলবে। হুড্রুর সেই ছায়া-ছায়া ডাইন এসব নষ্টামিকে ক্ষমা করে না।

—তবে যাও, বলে এসো গিয়ে।

—যেতাম ঠিকই, কিন্তু···এত আপ স্ট্রীমে খাড়াই ভেঙে হাঁটা-হাঁটি করা আমার পক্ষে···যাই হোক্···তুমি আগে আমাকে এক বাটি চা আর এক ডজন পেঁয়াজ-বড়া দাও।

আগে এক ডজন পেঁয়াজ-বড়া ভেজে নিয়ে তারপর চা তৈরি করেন শ্যামার মা। কেদারবাবুও গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আর গরম পেঁয়াজ-বড়া চিবিয়ে কথা বলেন—যাকগে, থাকগে ওরা তেতো ঘুঘুর মাংস। জব্দ হোক একটু। ওদের কথা ভাবছি না। ভাবছি ঐ মেয়েগুলো, যাদের সঙ্গে কোন পুরুষ নেই, ওরা যেন ভুল করে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি না করে।

শ্যামার মা বলেন—আমি যাই তবে; মেয়েগুলোর সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করে আসি···শ্যামা আর রমা, তোমরা হু'জনে মিলে আলুগুলো কুচিয়ে রাখ।

শীতের রোদ হলেও রোদটা এখন বেশ চন্‌চন্ করছে। মাথায় জড়ানো কম্ফর্টার খুলে কেদারবাবু গুনগুন করে গান গাইতে থাকেন। তারপরেই দেখে চমকে ওঠেন। শ্যামার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ কসমসের জঙ্গলটা যেন খিলখিল করে হাসছে। শ্যামার মা-ও হাসছেন।

কিসের এত হাসি ? একটা ভয়ের গল্প শুনতে পেয়ে মেয়েগুলো এত হাসে কেন ? আর, শ্যামার মা-ও বা ভয়ের গল্পটা শুনিয়ে দিতে গিয়ে এত হাসে কেন ?

তারপরেই কেদারবাবুর চোখের দৃষ্টিটা ক্ষুব্ধ হয়ে যেন কটমট করতে থাকে। শ্যামার মা ফিরে আসছে, আর ঐ চারটে

মেয়েও যেন ধেই ধেই করে জঙ্গল বেড়াতে ছুটে চলে গেল।

কেদারবাবু রুষ্টস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—কি হলো? গল্পটা ওদের বলেছিলে?

শ্যামার মা হাসতে থাকেন—বলেছি বইকি।

—কি বলে ওরা?

—ওরা বলে, খুব ভাল হলো। ওরা সেই ছায়া-ছায়া ভয়ের চেহারাটা দেখতে চায়।

—কি? ভ্রুকুটি করেন কেদারবাবু।

শ্যামার মা আবার হাসেন—আমার দিকে মিছে কেন চোখ পাকিয়ে কথা বলছ? আমি তো আর তোমার অবাধ্যতা করছি না। আমি তো একুশটা বছর ধরে ছায়া-ছায়া ভয়ের জ্বালায় ভুগছি।

কেদারবাবু—আজ আবার এত কথা শোনাচ্ছ কেন? একটা আহা-আহা আনন্দকে বিয়ে করলেই পারতে। কে বাধা দিয়েছিল? কে মানা করেছিল?

শ্যামা আর রমা আলু কুচোনোর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, আর মুখ লুকিয়ে হাসে।

শ্যামার মা একবার ভ্রুকুটি করেন—ছিঃ!

কেদারবাবুও শান্ত স্বরে বলেন—হ্যাঁ, ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। জেনে রেখ, তোমার কথা অসাবধান হলে আমার কথাও অসাবধান হয়ে যাবে।

শ্যামার মা—খিচুড়িতে বাদাম দেব?

কেদারবাবু—নিশ্চয়। এক মুঠো কিসমিসও দিও।

সুন্দর মুখ হিসাবে চারজনের মধ্যে যে শীলাদিকে ফোর্থ বলতেও পারেনি শ্যামা আর রমা, সেই শীলাদি এদের তিনজনেরও কাছে

শীলাদি। বয়সের দিক দিয়ে রেবা জয়া আর নীহারের চেয়ে শীলা অন্তত চার-পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু লোকের চোখে শীলার এই বড়ত্বটুকু ধরা পড়বে কিনা সন্দেহ। বরং মনে হবে, শীলার কাছে ওরাই তিনজন হলো দিদি-বয়সের মানুষ। শুধু ওরাই তিনজন জানে, শীলাদি ওদের চেয়ে পাঁচ বছরের সিনিয়র। শীলাদি যেদিন টিচার হয়ে স্কুলে কাজ নিয়েছে, ওরা তিনজন তার চার বছর পরে টিচার হয়ে স্কুলে এসেছে। এবং ওরা চারজনেই আজ এক হোস্টেলের বান্ধবী।

রেবার তো অভ্যাসটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন তখন বাঁ দিকের কানটাকে হাত দিয়ে চেপে ঢেকে রাখতে চায়। কানটার কোন দোষ নেই। বাইশ বছর বয়সেই রেবার বাঁ-কানের ওপরে মাথার বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে সব চুলগুলির প্রায় অর্ধেকই সাদা হয়ে গিয়েছে। নীহার একটু রোগাটে, গলাটা একটু বেশি সরু; তাই হাইকলার জামা গায়ে দিতে হয়; এবং নিজেও স্বীকার করে—হাইকলারে চেহারাটা যে আরও বুড়ি বুড়ি দেখাচ্ছে শীলাদি!

শীলা হাসে। জয়া বলে—এক বছর ধরে চিৎ হয়ে শোওয়া অভ্যেস করলাম, তবু তো কুঁজোত্বটা একটুও সারলো না।

শীলা হাসে—বিয়ে হলেই সেরে যাবে।

জয়া—আর বিয়ে!

শীলা—তার মানে? কটকের পাত্র কি বলে?

জয়া—পাত্রের বাবা কাকাকে চিঠি দিয়েছেন, মেয়ের বয়স একটু বেশি বলেই···

শীলা—তার মানে?

জয়া—তার মানে কাকার সত্যি কথাটাও বিশ্বাস করলেন না কটকের পাত্রের বাবা। কাকা বললেন তেইশ; কটক বললে, হতেই পারে না। অন্তত ত্রিশের কম নয়।

অথচ শীলাদির বয়সটা ত্রিশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও যেন কুড়ি বছরটির হয়ে রয়েছে। গলার স্বরটা তো পনের বছর বয়সের মেয়ের গলার স্বরের মত ঝংকার দিয়ে বাজে। হাসলেও যেন একটা কাঁচা বয়সের খুশির ঝর্ণা কলকল করে বেজে ওঠে। আর, সারা শরীরের গড়নটাও কী চমৎকার। ঘাড় গলা কোমর; হাতের আঙুলগুলিও, যেন কতগুলি নিখুঁত সৃষ্টির ছাঁদ।

জয়া বলে—আমার বিপদটাও কম যায় না।

শীলা—তোমার আবার বিপদ কিসের? গায়ের রঙটি যার এমন দুধে-আলতা···

জয়া—থাম শীলাদি। দুধে-আলতা রঙ কি ধুয়ে খাব?

শীলা—তুমি ধুয়ে খাবে কেন? যার খাবার হবে সে খাবে।

জয়া—চুপ! শাট-আপ! মামার বড় ছেলে শশাঙ্কদার বিয়েতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম, সেটা তো জান না।

—কি?

—শশাঙ্কদা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। অথচ আমাকে দেখেই একেবারে দিদি বলে ডেকে আর হাত বাড়িয়ে পা ছোঁয়ার জন্য···আমি তো একলাফে সরে গিয়ে বাঁচি।

—এরকম ভুল করলেন কেন তোমার শশাঙ্কদা? অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না বোধহয়?

—তা বটে। কিন্তু তা ছাড়াও···

—কি?

—মামী বললেন, শশাঙ্কর দোষ নেই। আমার চোখের চাউনিটাই নাকি বেশ বুড়োটে হয়ে গিয়েছে। কেউ ধারণাই করতে পারবে না, আমার বয়সটা তেইশের বেশি নয়। অথচ, তুমি শীলাদি সত্যি অদ্ভুত, তোমার চোখ দুটোও এত কাঁচা যে, তোমাকে আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

রেবা জয়া আর নীহার তিনজনেই আর-একটা ব্যাপার নিয়ে

মাঝে মাঝে শীলার সঙ্গে তর্ক করে; তর্কের রকমটা অনেক সময় ঝগড়ার মত ভঙ্গী ধরে বেশ তিক্তও হয়ে ওঠে। কারণটা শীলারই একটা বাতিকের ব্যাপার। আয়নার বিরুদ্ধে যেন ভয়ানক একটা রাগ, কিংবা অভিমানমাখা ঘৃণা আছে শীলার। আয়না ছুঁতেই চায় না শীলা। চুল বাঁধার সময়েও আয়নার কাছে দাঁড়ায় না।

নীহার বলে—এটা তোমার একটু বেশি রকমের ঢং হয়ে যাচ্ছে শীলাদি।

শীলা হাসে—পোড়া মুখের চেহারা আয়নাতে না দেখলেও চলবে।

শীলার রঙটা কালো; মুখের রঙ নীহারের দুধ-আলতা রং-এর মুখটার ঠিক উল্টোটি। কিন্তু শুধু সেজন্যেই বোধহয় নয়। যত নিখুঁত গড়ন আর ছাঁদ যেন শীলার মুখটাকে বাদ দিয়ে শুধু শরীরটাকেই জড়িয়ে ধরেছে। কপালটা, নাকটা আর থুঁতনিটা ওরকম ঢিবি-ঢিবি রকমের না হলে এ চারজনের মধ্যে ওকে ফোর্থ বলে মনে করবার সাধ্যি কারও হতো না। শীলা বোধহয় তাহলে ওর ঐ কালো রঙ নিয়েই একটা রূপের বিস্ময় হয়ে উঠতো।

শীলার হাঁটবার ভঙ্গীটাও অদ্ভুত। শরীরটার যেন কোন ভার নেই; তর্‌তর্‌ করে যেন একটা ছবির শরীর হেঁটে চলে যায়।

পিছিয়ে পড়েছে নীহার। তাই চেঁচিয়ে ডাক দেয়।—একটু আস্তে চল শীলাদি।

রেবা আর জয়াও অভিযোগ করে—শীলাদিকে আজ যেন বনহরিণীর ফুর্তিতে পেয়েছে। ওভাবে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটলে তুমি একাই জঙ্গল বেড়িয়ে এস শীলাদি। আমরা রইলাম।

শীলা হাসে—তোমরা হাঁটতে পারছ না কাঁটার ভয়ে। পায়ে কাঁটা ফুটবে, শাড়ি ফেঁসে যাবে, এমন ভয় থাকলে জঙ্গল বেড়ানো যায় না।

অভিযোগটা একেবারে মিথ্যে নয়। শীলার দিকে তাকিয়ে ওরা দেখতে পায়, এরই মধ্যে শীলার শাড়িটা তিন জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

পায়ের একটা আঙুলের ফাঁকে কাঁটা বিঁধেছে, রক্তের ছিটে ধুলোমাখা হয়েও লাল হয়ে রয়েছে। খোঁপাটা ভেঙে গিয়ে পিঠের উপর ঝুলে রয়েছে। আর, কে জানে কখন, এই হরতকী জঙ্গলের ভেতরেই কোন্ বুনো ফুলের গাছ থেকে মস্ত বড় একটা সাদা ফুল তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে শীলা; দেখতে পায়নি নীহার রেবা আর জয়া।

—আর কত নামবে, শীলাদি? আমার যে সত্যিই একটু ভয়-ভয় করছে। হেসে হেসে আর ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করে রেবা।

সত্যিই একটা গড়ানো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু হাঁটুরে পথ ধরে অনেক নীচে নেমে এসেছে ওরা। এখানে দাঁড়িয়ে আর ওপর দিকে তাকালে শ্যামা আর রমাদের খিচুড়ি রান্নার ধোঁয়াটা শুধু একটুখানি দেখা যায়।

নীহার বলে—আঃ, এখানেই বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

জয়া বলে—ওদিকে গাছের মাথার উপর মাছরাঙা উড়ছে কেন?

শীলা বলে—কোন ঝিল-টিল আছে বোধহয়।

রেবা আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে—না না, আর অতদূর নয়।

শীলা—অতদূরে কোথায়, এই তো কত কাছে। যেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

রেবাকে আর অনুরোধ করতে হয় না। রেবা নিজেই যেন একটা দুরন্ত কৌতূহলের আবেগে গলা টান করে আর চোখ তুলে কচি শালের সেই ফাঁকা ফাঁকা জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জঙ্গলটা যেন বিরাট একটা আলো-ছায়া ভরা হলের মত। খাড়া খাড়া গাছ বড় বড় থামের মত দাঁড়িয়ে আছে, আর গাছেরই ছায়াগুলি টানা হয়ে মাটির উপর লুটিয়ে শুয়ে আছে। জঙ্গলের ভেতরে ছোট-ছোট ঝোপ আছে ঠিকই, কিন্তু ঝোপগুলির সারা গা যেন লাল প্রবালের গুটিতে ছেয়ে গেছে।

নীহার—সিংহীর মত ওভাবে ঘাড় গলা উঁচিয়ে কি দেখছ রেবা?

রেবা—বুনো কুল পেকেছে।

—কোথায় ?

—ঐ যে, দেখতে পাচ্ছ না কেন ?

আর কোন কথা নয়। তর্ক করবারও আর দরকার হয় না। চারজনেই একসঙ্গে বুনো কুলের কুঞ্জের দিকে যেন পাগলিনী অভিসারিকার মত আলুথালু হয়ে ছুটে যায়।

নীহার বলে—যদি আগে জানতাম, তবে এক ডিবে নুন সঙ্গে নিয়ে আসতাম।

বুনো কুল খাওয়ার পালা যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, জয়া বলে—কুলুকুলু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যেন।

ঠিকই, চারজনেই এগিয়ে যেয়ে দেখতে পায়, খুব রোগা একটা স্রোতের ধারা কলকল করে বালু আর নুড়ির উপর দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এটা হুড্রুর ঐ বড় ধারার নীচের খাতের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা একলা খুশির স্রোত।

—ইস্, সত্যিই যে গা ছমছম করছে। ফিসফিস করে কথা বলে নীহার।

রোগা স্রোতের এই মৃদু কলকল শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ এখানে নেই। হুড্রুর ভয়াল গর্জনের প্রতিধ্বনিটা যেন দুপুরের বাতাসের ঝড়ের সঙ্গে ওদিকে উড়ে চলে গিয়েছে, এদিকে আসতেই পারেনি। এদিকে শুধু স্তব্ধতা। শালের মাথাগুলি একটুও দোলে না।

জয়া বলে—এই সময় যদি সেই ছায়া-ছায়া জীবটা এখানে এসে দাঁড়ায় শীলাদি ?

রেবা—ঠাট্টা করেও ওভাবে কথা বলো না জয়া। আমার সত্যিই বিশ্রী লাগছে।

শীলা চেঁচিয়ে ওঠে—ঐ যে, ঐ ওখানে মাছরাঙা উড়ছে।

হ্যাঁ, আর একটু দূরে, এই গা-ছমছম নির্জনতার জগতের একটা গোপন নিভৃতে মাছরাঙা উড়ছে দেখা যায়।

শীলা বলে—মাছরাঙা যখন আছে, তখন ওখানে মাছও আছে নিশ্চয়। নিশ্চয় একটা ঝিল আছে।

জয়া—থাক ঝিল। ওদিকে আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু জয়ারই চোখ দুটো ওদিকের একটা বিস্ময়ের দিকে যেন লোভীর মত তাকিয়ে থাকে—ওগুলো আমলকী বলে মনে হচ্ছে যে!

নীহার—অ্যাঁ, কোথায়?

রেবা—পাকা আমলকী নাকি অমৃতফল, খেলে মরণ হয় না।

শীলা বলে—হ্যাঁ, আমলকী। সত্যি আমলকী।

গাছভরা আমলকী যেন গাছভরা সুস্বাদুতার আঙুর। দৌড় দিয়ে ছুটে এগিয়ে যেতেও দেরি হয় না। দেখা যায়, এরকম লোভের প্রেরণা যেখানে থাকে, সেখানে রেবা নীহার আর জয়া শীলার চেয়েও বেপরোয়া হয়ে দৌড় দিতে পারে।

হুটোপুটি করে এক গাদা আমলকী ছিঁড়ে কোঁচড়ে ভরতে ভরতে রেবা বলে—শীলাদি, এবার তুমি কিন্তু আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারনি।

শীলা—আমি তো আমলকীর জন্যে ব্যস্ত নই।

জয়া—হঠাৎ এরকম অব্যস্ততা কেন?

শীলা—আমি খুঁজছি ঝিলটাকে।

জয়া—কেন?

শীলা—চান করবো।

নীহার—সাবধান শীলাদি, এত সাহসের শখ ভাল নয়। বুড়ো মানুষের উপদেশ তুচ্ছ করো না।

শীলা হাসে—বল কি? এরকম একটা নির্জন জায়গাতে একটা ঝিল পেলে গা ডুবিয়ে চান করবো না?

রেবা—কাজ নেই শীলাদি। ছায়া-ছায়া সেই মতলবটা নাকি জলের কাছাকাছি থাকে।

সত্যিই তো, আমলকীর জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে

কাকচক্ষু জলের বেশ খোলামেলা একটা দহ টলমল করছে। সাদা আর কালো পাথরের কাটা-কাটা খাঁজ দহটার তু'পাশে যেন ফ্রেমের মত আঁটা। বুঝতে পারা যায়, সেই রোগা স্রোতটাই গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে এসে একটা দহ হয়ে আবার ওদিকের পাথর ছাপিয়ে আর একটা ঝর্ণা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

কুচো কুচো রুপোর মত চেহারার মাছের ঝাঁক ছটফটিয়ে দহের কাকচক্ষু জল শিউরে দিয়ে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে রঙীন মাছরাঙা। যেন বাতাসের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকা একটা রঙীন উল্লাসের প্রাণ চোখের পলক না ফুরোতেই রুপোর কুচির মত সাদা মাছ ছোঁ মেরে লুটে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

নীহার বলে—মাছরাঙার কাণ্ড দেখেও যে আমার ভয় করছে শীলাদি।

শীলা—কিন্তু দহের হাঁস তুটোকে দেখে কেমন লাগছে?

হাঁস? হ্যাঁ, সত্যিই ছোট-ছোট রঙীন মাখনের ডেলার মত তুটো হাঁস দহের জলের মাঝখানে তুটো সাদা পাথরের গায়ের শেওলাতে ঠোঁট ঘষে ঘষে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শীলা বলে—আমি জানি, এগুলো অনেক দূরের হাঁস। শীতকালে এখানে আসে।

রেবা বলে—হাঁস ধরবার জন্যে আবার যেন বায়না ধরো না শীলাদি।

শীলা—ধরতে পারলে ভাল ছিল।

জয়া—কখ্‌খনো না।

শীলা—একবার ধরে নিয়েই ছেড়ে দিতাম।

নীহার—না। ও রঙীন হাঁস কোলে করবার জন্যে লোভ না করে নিজেরই একটা···

চেঁচিয়ে উঠে রেবা—ওকি শীলাদি? তোমার মতলব কি?

জলের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শীলা। আর চোখের হাসিটা যেন দহের কাকচক্ষু জলের মত টলমল করছে।

জয়া—সত্যিই কি···

শীলা—হ্যাঁ, গা ডুবিয়ে একবার চান করবার এমন চান্স জীবনে আর পাওয়া যাবে না।

নীহার—আঃ, কি করছো শীলাদি! জায়গাটাকে কি একটা বাথরুম মনে করলে?

শীলা—যা-ই বল, আমি গা ডুবিয়ে চান করবোই।

রেবা—শাড়ি ভেজাবে?

শীলা—না।

জয়া—তবে?

শীলা—শাড়ি না ভেজালেও চলবে; কোন অসুবিধে নেই।

নীহার রাগ করে—সত্যিই শীলাদির শখের মাথামুণ্ডু নেই।

শীলা—এই তো চমৎকার একটা পাথরের আড়াল রয়েছে। তোমাদের চোখ আমার মাথামুণ্ডু কিছুই দেখতে পাবে না। তোমরা চুপ করে ওখানেই বসে গান গাও।

ওদিকে পাথরটার আড়ালে কাকচক্ষু জল ছলছল করে। এদিকে নীহার রেবা আর জয়া মাঝে মাঝে গল্প থামিয়ে অস্বস্তিময় উদ্বেগের স্বরে ডাক দেয়—আর কতক্ষণ? এবার উঠে এস শীলাদি।

শীলার গলার স্বরও উচ্ছল হয়ে জবাব দেয়—এই হয়ে এল। যাচ্ছি।

রঙীন হাঁস দুটো অনেক দূরে চলে গিয়েছে। শীলাও উঠে এসেছে। জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে খোঁপাটা। সেই ভিজে খোঁপারই মধ্যে সাদা বুনো ফুলটাকে আবার গুঁজে দিয়ে শীলা বলে—চল, এবার কোন্ দিকে যাবে?

জয়া চমকে ওঠে—ওকি? ওখানে ওসব কি পড়ে আছে?

বাঘের থাবার চিহ্ন দেখলে চোখের বিস্ময় যেমন ভীরু-ভীরু হয়ে যায়, জয়ার চোখে যেন সেই রকমের একটা ভীরু বিস্ময় চমকে উঠেছে।

চমকে ওঠে সকলেই। নীহার আর রেবার চোখে যেন বিপন্ন মানুষের চোখের মত একটা আতঙ্কের ছায়া। আর, শীলার চোখে একটা দুরন্ত কৌতূহল। ঐ ওখানে, যেখানে পাথরের ওপারের আড়ালে স্নান করেছে শীলা, সেখান থেকে একটু দূরে, একটা পিয়ালের ছায়াতে, দহের কিনারায় একটা বড় পাথরের উপর কতগুলি কাগজ নুড়ি চাপা হয়ে পড়ে আছে। তার কাছেই চীনেমাটির ছোট ছোট কয়েকটা বাটি। একটা এনামেলের থালা, তার ওপরে তিন-চারটে তুলি।

নীহার বলে—এখানে লোক আছে বলে মনে হচ্ছে।

রেবা—লোকটার বোধহয় ছবি আঁকার অভ্যেস।

জয়া—লোকটা আজই এসেছে বলে মনে হচ্ছে। সিগারেটের খালি বাক্স পড়ে আছে।

শীলা—চল, এগিয়ে যেয়ে দেখি।

রেবা—না। বলতে তোমার একটুও ভয় করছে না শীলাদি? আশ্চর্য!

জয়া—কখ্‌খনো না। তুমি সত্যিই খুব বিশ্রী একটা কাণ্ড করলে শীলাদি।

নীহার—কোন দরকার নেই যেয়ে।

শীলা হাসে—শ্যামার মা তো এমন গল্প বলেননি যে, সেই ছায়া-ছায়া জীবটার ছবি-টবি আঁকা অভ্যেস আছে।

নীহার—বলতে বোধহয় ভুলে গিয়েছেন।

জয়া—ছায়া-ছায়া না হয়ে যদি কায়া-কায়া হয়, তাতেই বা কি? আমার এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না।

রেবা—এদিকে আসা খুবই ভুল হয়েছে শীলাদি।

শীলা হাসে—তোমরা সবাই যদি রাজী হও, আমি তবে এখনি এক ঠেলা দিয়ে ওসব কাগজ-টাগজ দহের জলে ফেলে দিয়ে আসতে পারি।

মস্ত বড় যে পাথরের চাঙড়টার আড়ালে স্নান করেছিল শীলা, সেই পাথরেরই কাছে শালের ছায়ার আড়াল থেকে যেন একটা কায়াহীন ছায়ার গলার স্বর বেজে ওঠে—ওগুলো আমিই ওখানে রেখেছি। জলে ফেলে দেবেন না।

রেবা নীহার আর জয়া একসঙ্গে শীলার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকে।—কি ভয়ানক কাণ্ড, কি উপায় হবে শীলাদি ?

নীহার রেবা আর জয়ার হাত ছাড়িয়ে শীলা দু'পা এগিয়ে যেয়ে পাথরের চাঙড়ের ওদিকের একটা নিরালার দিকে তাকায়; এক ভদ্রলোক হরিণের চামড়ার একটা আসনের উপর বসে, আর দুভাঁজ করা একটা সিল্কের চাদরের উপর চাল ডাল আর আলু সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। মাটির একটা সরার উপরে বেশ বড় একটা ছুরি আর চামচও আছে। তিনটে পাথর জড় করে একটা উনুনও তৈরি করেছে ভদ্রলোক। উনুনের একপাশে শুকনো কাঁটালতার একটা গাদাও পড়ে আছে।

শীলা ফিরে এসে বলে—তোমাদের ভয়টাকেই বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে রেবা।

রেবা—কি করবো বল ?

শীলা—সব চেয়ে ভাল হয়, ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাই।

নীহার—তবে তাই কর। খুব তাড়াতাড়ি কর শীলাদি।

জয়া—আমি কিন্তু তোমাদের সবার পেছনে থাকবো।

ছিপছিপে অথচ বেশ শক্ত চেহারার এক ভদ্রলোক। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা হয়েও কেমন যেন পোড়া-পোড়া; যেন একটা কালচে ছায়া মাখানো ফর্সা চেহারা। চোখ দুটো খুব কালো; আরও কালো আর ঘন হলো চোখের ভুরু দুটো।

ভদ্রলোক যেন একটা শৌখীন দীনতার ছবি। ময়লা খাকি

ট্রাউজারটা চোরকাঁটায় ভরে গিয়েছে, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন একটা রঙীন সিল্কের তোয়ালেকে শক্ত করে কোমরে বেঁধেছেন ভদ্রলোক; বেল্ট নেই বোধহয়। দেখতে অদ্ভুত লাগে। কয়েক মুঠো চাল ডাল আর কয়েকটা আলুকে কত পরিপাটি করে একটা দোভাঁজ সিল্কের চাদরের উপর সাজিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে একটু সিল্ক-পাগল বলে মনে হয়।

উনুনের পাথর তিনটেও কী চমৎকার ভঙ্গীতে বসানো হয়েছে। আর শুকনো কাঁটালতার ডাঁটিগুলিকেও যেন বেশ যত্ন করে সমান সাইজে ভেঙে ভেঙে রেখেছেন ভদ্রলোক। এখুনি উনুনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যে বস্তু, সে-বস্তুকেও কত পরিপাটি করে একপাশে সাজিয়ে রেখেছেন। হোমের আগুনের কাঠকেও যে এরকমের সুদৃশ্য চেহারা দিয়ে আর গুছিয়ে কেউ সাজিয়ে রাখে না। পাগলের শখ, না, শখের পাগলামি?

ভদ্রলোকের ঐ সামান্য অথচ শৌখীন পিকনিকের ঠাঁইটার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই চারটে কৌতূহলের মূর্তি যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে থেমে যায়। কথা বলছেন ভদ্রলোক। বেশ শান্ত স্বরে বেশ অভদ্রতার কয়েকটা কথা।—কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সঙ্গে বেশি কথা বলবার সময় আমার নেই।

নীহার রেবা আর জয়া একসঙ্গে চাপা-গলায় ফিসফিসিয়ে ওঠে—ওরে বাবা! কথার কি ছিরি!

এমন লোকের সঙ্গে কথা বলবার দরকারই বা কি? কিন্তু কি আশ্চর্য, শীলাদির চোখে যেন একটুও বিরক্তি নেই। এরকম একটা ভদ্রভাষার অভদ্র ধমক খেয়েও কি শীলাদি ঐ অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চায়?

ঠিকই সন্দেহ করেছে নীহার জয়া আর রেবা। শীলা বলে—আপনি কেমন করে বুঝলেন যে, আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলবার কোন গরজ আছে আমাদের?

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে, আর ট্রাউজারের পকেট থেকে চকচকে কালো একটা পাইপ বের করে মুখের কাছে তুলে ধরেন। পাইপটাকে দাঁতে কামড়ে ধরেই কথা বলেন ভদ্রলোক।—আমার কথায় আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভুল করেছেন। অন্য সময় হলে আমি নিজেই যেচে আপনাদের কাছে অনেক কথা অনেক গল্প বলতে পারতাম। কিন্তু আজ, সময় বেশি নেই বলে, আর বিকেল ফুরোবার আগে আমাকে অনেকগুলি স্কেচ সারতে হবে বলেই আপনাদের বলতে হয়েছে···

শীলা—আপনি ছবি আঁকুন না। আমরা তো বাধা দিতে আসিনি।

ভদ্রলোক হাসেন—আপনারা এখানে থাকলেই সেটা আমার পক্ষে বেশ বাধা হবে। তার মানে, আমার একটা খুব নিরিবিলি জায়গা দরকার। সেই জন্যেই ওদিকের পিকনিকের ভিড় থেকে এদিকে সরে এসেছি।

এর পর আর এখানে এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। ভদ্রলোকের মুখের ভাষাটা যেন হেসে হেসে চারজনকে এই মুহূর্তে খেদিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু···তবু···নীহার ফিসফিস করে রেবার কানের কাছে কথা বলে—কিন্তু শীলাদি সত্যিই বড় বেহায়াপানা শুরু করে দিয়েছে। আবার কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে।

শীলা বলে—কিন্তু আপনি ছবি আঁকবেন কখন ?

—এখনি।

—রান্না শেষ হবে কখন ?

—এই, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

—কি রান্না করবেন ?

—খিচুড়ি।

—কিসে রান্না করবেন ?

—কেন ? এই উনুনে।

—উনুন না হয় হলো। কিন্তু খিচুড়ি ফুটবে কোথায়, কোন্ হাঁড়িতে ?

—কি বললেন ?

—হাঁড়ি-টাড়ি সঙ্গে এনেছেন ?

— হাঁড়ি-টাড়ি ?

—হ্যাঁ।

—না।

—কোনঁ ডেকচি কিংবা প্যান ?

—না।

—তবে খিচুড়ি কি হাওয়ার উপর ভাসবে আর টগবগ করে ফুটবে ?

—তাই তো। একটা পাত্র, অন্তত একটা কলসি সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

রেবা নীহার আর জয়া হাসি লুকোতে গিয়ে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। শীলা বলে—কলসি না আনলেও চলতো, যদি একটা ছোট বালতি সঙ্গে আনতেন।

—ছোট বালতি ?

—হ্যাঁ। এনেছেন নাকি ?

—না। তবে একটা···

—কি ?

—টিনের মস্ত বড় একটা কৌটো আছে।

নীহার জয়া আর রেবা এবার হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে শুরু করে।

শীলা বলে—মস্ত বড় মানে কত বড় ?

ভদ্রলোক—দু'সের ঘি ধরে।

শীলা—ঘি এনেছেন সঙ্গে ?

—না। আমি ঘি খাই না।

—শুধু কৌটোটা এনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কই, এরকম কোন কৌটো তো দেখছি না।

—এখানে নয়, কৌটোটা ওখানে আছে। ওটা আমার তুলি রাখবার কৌটো।

—তাহলে নিয়ে আসুন।

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে চলে যায়। নীহার বলে—আর ভাল লাগছে না শীলাদি।

রেবা—অচেনা-অজানা একজন লোকের সঙ্গে বেশি হাসি-তামাশা ভাল নয় শীলাদি।

শীলা হাসে—ভদ্রলোকের হেড-অফিসে বেশ গোলমাল আছে মনে হচ্ছে।

জয়া—চাল-ডাল পুড়িয়ে খাক হাফ-পাগলটা। চলো, এবার আমরা সরে পড়ি।

কিন্তু ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কৌটোটা হাতে নিয়ে ফিরেছেন।

শীলা বলে—এবার এই কৌটোটাকে ভাল করে একবার ধুয়ে নিন। তারপর উনুন ধরান।

—আজ্ঞে ?

—উনুন ধরলে এই কৌটোটার অর্ধেকটা জলে ভরে উনুনের ওপর চাপিয়ে দিন।

—শুধু জল ?

—হ্যাঁ। জল ফুটলে এক মুঠো চাল আর দু' মুঠো ডাল ছেড়ে দেবেন। তারপর···

—জল ফুটবে তো ?

ভদ্রলোক অদ্ভুত রকমের একটা দৃষ্টি তুলে শীলার মুখের দিকে তাকিয়েছে, যেন একটা বিষণ্ণ মূঢ়তার করুণ দৃষ্টি। শীলার চোখ দুটোও যেন বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

জয়ার কানের কাছে ফিসফিস করে রেবা—লক্ষণ ভাল নয় জয়া। আমার কিন্তু দেখতে খুব খারাপ লাগছে।

জয়া—কি?

রেবা—শীলাদি শেষে একটা কাণ্ড না করে বসে।

জয়া—কিসের কাণ্ড?

রেবা—এবার হয়তো টিনের কৌটোতে খিচুড়ি রাঁধতে বসে যাবে শীলাদি।

জয়া—সর্বনাশ!

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হাফ-পাগলের মত লজ্জিতভাবে হেসে কথা বলেন।—সত্যিই, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না···তার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না···

শীলা—এর আগে কখনো রান্না-টান্না করেছেন?

—আজ্ঞে না।

—রান্না-টান্না দেখেনও নি?

—দেখেছি; কিন্তু মনে করতে পারছি না, ঠিক কেমন করে··· কিভাবে···

—তাহলে একটা কাজ করুন।

—বলুন।

—আপনি ওদিকে গিয়ে বসুন।

—আজ্ঞে?

—আমি রেঁধেই দেখিয়ে দিচ্ছি।

চম্‌কে উঠে নীহারের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বিড়বিড় করে জয়া—সর্বনাশ! মিথ্যে সন্দেহ করনি নীহার।

ভদ্রলোক এরই মধ্যে ওপাশের পলাশটার কাছে সরে গিয়ে গাছের ছায়ার সঙ্গে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন, আর মুখ ভরে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছেন।

নীহার চাপা গলায় বলে—বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে শীলাদি।

শীলা হাসে—কেন ?

জয়া—ভদ্রলোক রান্না করতে জানেন না ; শুধু রান্নার নিয়মটা বলে দিয়ে চলে গেলেই হতো।

রেবা—তাছাড়া, এসব কাণ্ড করলে এখানেই যে দুপুর পার হয়ে যাবে ; সেটা ভেবে দেখেছ ?

শীলা হাসে—সত্যি কথা, আমার কিন্তু বেশ একটু মজাই লাগছে নীহার।

নীহার—আমার বিশ্রী লাগছে।

শীলা—বিশ্রী লাগবার কি আছে ? একটা খামখেয়ালী আর্টিস্ট মানুষ, রান্না-টান্না করবার নিয়মই জানে না ; এ ছাড়া বেচারার আর কি দোষ দেখলে বল ?

রেবা মুখ টিপে হেসে ফেলে—এই সেরেছে !

শীলা—কি হলো ?

রেবা—এরই মধ্যে লোকটা তোমার কাছে বেচারা হয়ে গেল।

জয়াও হাসে—তোমার বেচারা কিন্তু বেশ জ্বালাবে বলে মনে হচ্ছে শীলাদি।

শীলা—কেন ?

জয়া—দেখছ না, তোমার হাতের খিচুড়ি খাবে বলে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে পাইপ টানছে।

শীলা—সত্যিই ভাবতে একটু মায়া লাগছে জয়া।

জয়া—লাগুক ; কিন্তু তুমি এখন চল।

নীহার আর রেবাও বলে—চল শীলাদি

শীলা—আর একটু থেকে যাও নীহার।

নীহার রেবা আর জয়া গম্ভীর হয়ে একসঙ্গেঃ

শীলা—কিন্তু…

শীলার মুখের দিকে কঠোর ভ্রূকুটি তুলে তাকায় নীহার—কিন্তু আবার কি ? তুমি খুব সাহসী জানি, এত সাহস দেখিওনা শীলাদি।

হঠাৎ চমকে ওঠে শীলা, সেই নীহার রেবা আর জয়াও। ভদ্রলোক উঠে এসেছেন।

ভদ্রলোক বলেন—আমার মনে হচ্ছে, আমি ভুল করছি। আপনাদের দিয়ে এসব কাজ করানো আমার খুব অন্যায় হচ্ছে। আপনারা না হয় ভদ্রতা করছেন, কিন্তু আমার পক্ষে নিতান্ত অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে।

শীলা হাসে—তা হলে রান্না-টান্না এখন…

—আজ্ঞে না। কোন দরকার নেই। আমি চলেই যাই।

শীলা—কোথায় যাবেন ?

—টাউনে ফিরে যাই। এবার আর ছবি আঁকা সম্ভব হবে না। দেখি, আসছে বছর আবার যদি আসতে পারি।

শীলা—একেবারে না খেয়ে-দেয়েই চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ ; কোন অসুবিধে নেই। ওসব আমার খুব অভ্যাস আছে।

ভদ্রলোক সত্যিই ব্যস্তভাবে এগিয়ে যেয়ে, আর সেই কাকচক্ষু জলের দহটার কাছে গিয়ে ছবি আঁকবার যত কাগজ আর সাজসরঞ্জাম ঝোলার মধ্যে ভরতে থাকেন।

শীলা গম্ভীর হয়ে বলে—আমরাই ভদ্রলোককে তাড়িয়ে ছাড়লাম।

নীহার—ভগবান জানেন ; আমরা কি অপরাধ করলাম ?

রেবা—ভদ্রলোক কিন্তু অভদ্র নয় বলেই মনে হচ্ছে।

জয়া—ওরকম লোককে ভয় করে না ঠিকই, তবু…

শীলা—আমি কিন্তু একটা কাণ্ড করবো।

নীহার—কি ?

শীলা—রান্নাটা করেই দিয়ে যাব। এই তো এক কৌটো খিচুড়ি, রাঁধতে কতক্ষণই বা লাগবে ?

জয়া—তবে আমরা কি করি ?

শীলা—তোমরা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প-টল্প কর।

জয়া—অসম্ভব।

নীহার আর রেবা বলে—আমরা কিন্তু চলে যাব শীলাদি। তুমি আর একবার ভেবে দেখ।

শীলা—কি ভাববো?

রেবা—এখানে তোমার একা-একা থাকা উচিত হবে কিনা।

শীলা—উচিত নয় জানি, কিন্তু ভয়ও নেই জানি।

নীহার রেবা আর জয়া আবার গম্ভীর হয়ে যায়। ঐ ভদ্রলোককে ভয়ানক বলে মনে হয় না ঠিকই, কিন্তু শীলার চোখ দুটোকে দেখতে ভয়-ভয় করছে। যে-মেয়ের আর ক-দিন পরেই অমন একজন সুন্দর কৃতী আর গুণী মানুষের সঙ্গে বিয়ে হবে, শীলার মত চেহারার মেয়ের পক্ষে যেটা স্বপ্নেরও অগোচর একটা সৌভাগ্য, সে-মেয়ে এখানে এরকম একটা জংলী নিরিবিলির মধ্যে একটা অচেনা-অজানা হাফ-পাগল মানুষের জন্য খিচুড়ি রাঁধবে, এরকম অনিয়মের যে কোন মানেই হয় না। এটা সম্ভবই বা হয় কেমন করে? শীলাদি যে সব-সময় হেসে হেসে নিজের মুখটাকে পোড়ামুখ বলে গাল দেয়, সেটা যে শুধু অভিমানের ভাষা নয়, একটা অহংকারেরও ভাষা। শীলার সঙ্গে চার বছর ধরে ভালবাসার সম্পর্কে শীলার জীবনের বান্ধব হয়ে গিয়েছেন যে ভদ্রলোক, সে ভদ্রলোককে নীহার রেবা আর জয়াও দেখেছে। নিজেরই ওপরে ভয়ানক অন্যায় করছে শীলা। আর যে-ই হোক, শীলার অন্তত আর কোন ভদ্রলোকের জন্য মায়া দেখাবার কোন মানে হয় না, উচিতও নয়।

কাকচক্ষু জলের দহটার দিকে তাকিয়ে শীলা হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দেয়—যাবেন না।

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে আর বেশ আশ্চর্য হয়ে তাকায়।—কেন?

শীলা—আপনি বসুন। আমি আপনার খিচুড়ি রেঁধে দিচ্ছি।

নীহার রেবা আর জয়া বলে—আমরা তবে যাই।

শীলা—হ্যাঁ, আমিও যত তাড়াতাড়ি পারি, যাচ্ছি।

নীহার রেবা আর জয়া খুব বেশি গম্ভীর হয়ে আর, যেন একটা আতঙ্কময় লজ্জার ভয়ে ভীরু হয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে যায়।

কেদারবাবু বলেন—আমার যে আর এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

শ্যামার মা বলেন—তবে একটু ঘুরে এস।

কেদারবাবু—হ্যাঁ ভাবছি, ঐ রাইফেল-সাহেবের কাছে গিয়ে একটু গল্প করে আসি।

শ্যামার মা—এতটা খাড়াই উঠতে পারবে?

কেদারবাবু—পারবো না বলেই জানতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পারবো।

—কেন?

—ঐ যে বাইনকুলার-সাহেব, তাঁকে একটু চেনা-চেনা মনে হলো। মনে হচ্ছে, রেল অফিসে ওঁকে একবার দেখেছি। বোধহয় ডি টি এস।

—তাতে তোমার কি?

—যদি একটু ভাব-সাব জমাতে পারি, তবে পাঁচুকে রেলের একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবার সুবিধে হবে। ডি টি এস পেছনে থাকলে একটা চাকরি হবেই হবে।

—তাই বল।

—বলবার আবার কি আছে? চাকরির জন্যে বাঙালী যে গন্ধমাদন ঘাড়ে করে সাগর ডিঙোতে পারে তা জান না?

—হনুমান যে বাঙালী ছিলেন তা জানতাম না।

—ঠাট্টার কথা নয়। সামান্য একটা খাড়াই ডিঙিয়ে যদি পাঁচুর চাকরিটার ব্যবস্থা করতে পারি, তবে···

শ্যামার মা—ব্যবস্থা করে এস, আমি তো আপত্তি করছি না।

লাঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে চললেন কেদারবাবু।

আর, হাঁপিয়ে পড়বার আগেই ছোট একটা তাঁবুর কাছে এসেই বুঝতে পারলেন, গন্ধটা মুর্গীর কারি রান্নার গন্ধ।

বাইনকুলার-সাহেব আর তাঁর বাঙালিনী মেম দু'জনেই কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে পাশাপাশি বসে আছেন। রাইফেল-সাহেব আর তাঁর বাঙালিনী মেম···না, এ দুজনকে তো ঠিক স্বামী-স্ত্রী বলে মনে হচ্ছে না। এ দুজনের বিয়েটা বোধ হয় হব-হব হয়েছে।

—গুড মর্নিং স্যার! গুড মর্নিং স্যার। দুই সাহেবকেই হেসে হেসে অভিনন্দিত করে এগিয়ে যান কেদারবাবু।

বাইনকুলার-সাহেব ও তাঁর স্ত্রী কেদারবাবুকে দেখে অপ্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু রাইফেল-সাহেব আর তাঁর···তাঁর ঐ আসন্না স্ত্রী বেশ অপ্রসন্ন হয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। তা না হলে, দুজনে ওভাবে ভ্রূকুটি তুলে কেদারবাবুর দিকে তাকাবেন কেন?

কেদারবাবু বলেন—ট্রেসপাস করলাম স্যার, কিছু মনে করবেন না। একা একা আর বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলেই ইচ্ছে হলো, যাই, সাহেবদের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।

বাইনকুলার-সাহেব বলেন—আলাপ করুন তাহলে।

—আপনি তো স্যার রেলের সাহেব।

—আজ্ঞে না। আমি একটা কোলিয়ারির সাহেব; দেখছেন না আমার গায়ের রঙ?

—ওটা তো কালো রঙ নয় স্যার; ওটা হলো—যাকে বলে শ্যামল রঙ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন বাইনকুলার-সাহেব।—এবার নিজের কানে শুনে নাও অরুণা। আমার গায়ের রঙ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আর সাহস করো না।

অরুণা মুখ টিপে হাসে। অরুণার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে একটা নমস্কারের ভঙ্গী ঠুকে দিয়েই প্রশ্ন করেন কেদারবাবু—আপনি হলেন গিয়ে···

বাইনকুলার-সাহেব বলেন—উনিই হলেন এই দীনহীনের জীবনের অধীশ্বরী।

কেদারবাবু—সে কি আর আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে স্যার? এক নজরেই দেখে বুঝে নিয়েছি।

বাইনকুলার-সাহেব—তবে বরুণার দিকে এক নজরে তাকিয়ে বলে দিন দেখি, বরুণা কার জীবনের অধীশ্বরী।

হ্যাঁ, বোঝা গেল, এ মহিলা, যিনি একটু ভ্রুকুটি করেই কেদারবাবুর দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁরই নাম বরুণা। বরুণার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু যেন একগাল লজ্জার হাসি হাসেন—উনি এখনও কারও অধীশ্বরী হননি।

বাইনকুলার-সাহেব চেঁচিয়ে ওঠেন—একদিন হবেন তো নিশ্চয়?

—তা হবেন বইকি।

—কবে হবেন?

—সেটা কি স্যার চোখে দেখে বলা যায়?

—কুমুদকে চোখে দেখেও কি আপনার চোখে কোন সন্দেহ দেখা দিচ্ছে না?

বোঝা গেল, রাইফেল-সাহেবের নাম কুমুদ, যিনি কেদারবাবুকে দেখা মাত্র বিশ্রী রকমের ভ্রুকুটি করেছিলেন।

কেদারবাবু কুমুদের দিকে তাকিয়ে বলেন—না স্যার; সন্দেহ করতে সাহস পাচ্ছি না স্যার।

বাইনকুলার-সাহেব—কেন?

কেদারবাবু—ওঁর হাতের রাইফেলটাকে দেখতে আমার একটুও ভাল লাগছে না স্যার।

বাইনকুলার-সাহেব—আঃ, আপনি অন্য কথায় চলে যাচ্ছেন কেন?

কুমুদ যেন একটা বিরক্তির ভাব চেপে দিয়ে হাসতে চেষ্টা করে—

আপনি একজন বাইরের লোকের সঙ্গে এত কথা বলতে শুরু করলেন কেন শঙ্করদা ?

বোঝা গেল, বাইনকুলার-সাহেবের নাম শঙ্কর। শঙ্কর ও অরুণা, আর কুমুদ ও বরুণা।

কেদারবাবু হাসেন—অরুণা বরুণা নিশ্চয় তুই বোন, স্যার ?

শঙ্কর বলে—এটা বুঝতে আপনার এত দেরি হলো ?

—একটু ভেবে-চিন্তে বুঝতে হচ্ছে স্যার।

—তবে একটু ভেবে-চিন্তে বলুন, কুমুদ আর বরুণাকে একসঙ্গে দেখলে আপনার কি মনে হবে ?

—কিছুই মনে হবে না, আমি তো কবি নই স্যার।

—কিন্তু আমার বেলায় তো খুব কবিত্ব করলেন !

—তা করেছি বটে।

কুমুদ ব্যস্তভাবে বলে—আমি আর বরুণা ওদিকে একটু ঘুরে আসি শঙ্করদা।

শঙ্কর—কোন্ দিকে ?

কুমুদ—ঐ যে, বুড়ো বটগাছটার কাছে। তু'চারটে হরিয়াল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

কেদারবাবু চমকে ওঠেন—মানা করুন স্যার।

শঙ্কর—কেন ?

কেদারবাবু—এখানকার হরিয়াল ঘুঘু কিংবা অন্য কোন পাখি মারলে বড়ই বিপদে পড়তে হয় স্যার।

শঙ্কর—কেন ? কে বাধা দেবে ?

কেদারবাবু—যে বাধা দেবে, তাকে চোখে দেখতে পাবেন না। সেটা একটা ছায়া-ছায়া চেহারার জীব, একটা ডাইন। বিশ্বাস না হয়, থানাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

—পুঃ ; কেদারবাবুর দিকে তাকিয়ে যেন তীব্র একটা তুচ্ছতার শব্দ ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে ডাক দেয় কুমুদ—চল বরুণা।

ছোট তাঁবুর ভিতর থেকে বয় বের হয়ে এসে কেদারবাবুর হাতের কাছে একটা পেয়ালা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অরুণা বলে—নিন, কফি খান।

কেদারবাবু—হ্যাঁ, বছর পাঁচ আগে একদিন কফি খেয়েছিলাম বটে। কিন্তু স্বাদটা ভুলেই গিয়েছি।

শঙ্কর—আপনি কি করেন?

কেদারবাবু—আমি রাঁচির আগরওয়ালা কোম্পানির ক্যাশিয়ার।

কুমুদ বলে—আমার মনে হয়েছিল, আপনি রাঁচির সেই পাগল হাসপাতালের একজন মেম্বার।

কেদারবাবু—আমাকে দেখে তাই মনে হয় বটে; কিন্তু আমি তা নই স্যার।

কুমুদ আর বরুণা হাসতে হাসতে চলে যায়। অরুণা বলে—আপনি মুর্গী খান?

কেদারবাবু—খুব খাই।

অরুণা—তবে খেয়ে যান।

কেদারবাবু—দিন তাহলে। কিন্তু স্যার···আমি সত্যিই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলাম।

শঙ্কর—বলুন।

কেদারবাবু—আমার ভাইপো পাঁচুকে আপনার কোলিয়ারির কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিন স্যার।

শঙ্কর—পাঁচুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—কোথায় আপনার দেখা পাওয়া যাবে স্যার?

—তেঁতুলপুরা কোলিয়ারি, কাতরাসগড়।

—সহস্র ধন্যবাদ স্যার।

চমকে ওঠেন কেদারবাবু। ঐ বটগাছের কাছে বন্দুকের শব্দ গর্জে উঠেছে। শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে কথা বলেন কেদারবাবু—বুড়ো মানুষের কথাটা তুচ্ছ করে কুমুদবাবু

শেষে হরিয়াল মারলেন বলে মনে হচ্ছে। উনি খুব ভুল করলেন স্যার।

শীলা হেসে হেসে বলে—আমি শুধু একবার এই এক কৌটো খিচুড়ি রেঁধে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর···

ভদ্রলোক বলে—তারপর আর আপনাকে কিছু করতে হবে না।

—বুঝলাম; কিন্তু, তারপর আরও বার দুই আপনাকে কষ্ট করতে হবে। এই ছোট্ট এক কৌটো খিচুড়িতে তো আপনার পেট ভরবে না।

—তা···না ভরুক; ওতেই হয়ে যাবে। আধপেটা খাওয়া আমার অভ্যেস আছে।

—ভাল অভ্যেস নয়।

—কি করবো বলুন? যা রোজগার, তাতে আধপেটা খাওয়া অভ্যেস থাকাই ভাল।

—কেন? আপনার ছবি বিক্রী হয় না?

—ছবি বিক্রী হবে? এদেশে? আপনি যে অদ্ভুত কথা বলছেন।

—কি করেন আপনি?

—আমি এক সাহেবের বাগানের বড় মালী।

—কি বললেন?

—গার্ডেন-ইন-চার্জ। কাজটা শুনতে যেমন মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। কাজটা ভাল। কিন্তু মাইনেটা মোটেই ভাল নয়।

—তবে অন্য একটা ভাল মাইনের কাজ ধরেন না কেন?

—মাঝে মাঝে যে ইচ্ছে করে না, তা নয়। কিন্তু ইচ্ছেটাই যেন শেষে বেঁকে বসে। যাই হোক, চলে তো যাচ্ছে।

—আপনার বাড়ির মানুষেরা কি এটা পছন্দ করেন?

—বাড়ির মানুষ বলতে কেউ নেই। সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান।

উনুনে আগুন জ্বলছে। টিনের কৌটোর জলও ফুটছে। কিন্তু, বুঝতে পারে না শীলা, হঠাৎ মনটা এমন অস্বস্তিতে ভরে উঠলো কেন? মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক যেন তাঁর তু'চোখের সেই ঘন-কালো তুটো ভ্রু টান করে শীলাকে দেখছে। দেখছে তো বয়ে গেছে; কিন্তু হঠাৎ এভাবে মনের অদ্ভুত একটা রাগ চেপে এখুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে কেন?

ভদ্রলোক বলে—আপনি কিন্তু আমাকে একেবারে আশ্চর্য করে দিয়েছেন।

চমকে ওঠে শীলা। আর চোখ তুলেই দেখতে পায়; ঠিকই, ভদ্রলোক অদ্ভুতভাবে শীলার দিকে তাকিয়ে আছে।

শীলা—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি আলুগুলো ধুয়ে নিয়ে আসুন।

—আমাকে দিয়ে আর কাজ-টাজ করাবেন না। যা হচ্ছে, ওতেই হবে। আলুটালু টানাটানি করবার দরকার নেই।

কৌটোর ভিতরে ফুটন্ত জলের মধ্যে তু'মুঠো চাল আর তু'মুঠো ডাল ছেড়ে দিয়েই শীলা বলে—আমি চলি। চাল-ডাল ফুটলেই নামিয়ে নেবেন।

—আপনি এখনি চলে যাবেন?

—যা বলেছি, শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়।

—আপনি আর একটু থেকে যান না।

শীলার শান্ত চোখ তুটো হঠাৎ কেঁপে ওঠে—কেন?

—আমি আমার ছবির জন্যে তু-চারটে কথা বলতে চাই।

—ছবির জন্যে?

—হ্যাঁ।

—তার মানে?

—তার মানে, আপনি যদি কিছুক্ষণ ঠিক এভাবেই এখানে চুপ করে বসতেন, তবে আমি ততক্ষণ…

—কি বললেন ?

—আমি একটা স্কেচ করে নিতে পারতাম।

শীলার বুকের ভিতর যেন দুঃসহ একটা ভয় এইবার ঢিপ ঢিপ করে বাজতে শুরু করে। লোকটা মানুষ নয়; সেই ছায়া-ছায়া ভয়টাই যেন মানুষের ছদ্মবেশ ধরে আর একজোড়া ঘন-কালো ভুরু তুলে শীলার মুখের দিকে একটা পিপাসিত লোভের মত তাকিয়ে আছে। কি ভয়ানক ভুল! একটা খেয়ালের দুঃসাহসে এই লোকটাকে একটা নির্দোষ বস্তু মাত্র মনে করে, এখানে থেকে গেছে শীলা। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত দেখা দিতে যে দশটা মিনিটও সময় লাগলো না।

লোকটা কিন্তু একটুও লজ্জিত না হয়ে, শীলার চোখের তীব্র দৃষ্টিটাকে একটুও গ্রাহ্য না করে আবার একটা অদ্ভুত কথা বলে।

—বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আজ যদি আমার হাতে এখন একটা ক্যামেরা থাকতো…

—সাবধানে কথা বলুন। ঠোঁটে দাঁত চেপে আর চোখের তারা থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে কথা বলে শীলা।

লোকটা বলে—তাহলে আপনার ফটো তুলতে চাইতাম না; ফটো তুলতে ইচ্ছেও করতো না; ফটো তুলতামও না।

নতুন রকমের একটা প্রলাপ। খুব চালাক প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এমন প্রলাপ বকে লোকটা কোন্ মতলবের জাল পাততে চাইছে ?

প্রলাপের [illegible] আবার কেমন কায়দা করে আর নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলছে লোকটা।—আপনার চেহারাটাকে আঁকবার জন্যে আমার চোখের কিংবা আমার তুলির কোন গরজ নেই। আপনার এই চেহারার মত…

লোকটার কুৎসিত দাবিটার ভাষাও কত কুৎসিত, কত অভদ্র! যেন শীলার চেহারাটাকেই কুৎসিত বলে গালি দিয়ে লোকটা…

লোকটা বলে—আপনার এই সুন্দর চেহারাটাকে আমি আঁকতে চাইছি না। চাইছি আপনার মনের ছবিটাকে আঁকতে।

—কি বললেন?

—আমার মনে হয়েছে, আপনার চেহারার এই নিখুঁত ছাঁদ যেন একটা নিখুঁত মনের ছাঁদ। চমৎকার একটি অকপট মন, আর একটু বেশি রকমের মায়াময় মন।

লোকটা যেন কথার কারিগর। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, কসাই যেমন ছুরি চালাবার আগে আদরের কথা বলে বধ্য প্রাণীটাকে ছলনা করে ভোলায়, লোকটাও ঠিক সেইরকমের আতুরে ভাষায় কথা বলছে।

—আমি আমার ছবি আঁকার গুরুর কাছ থেকে যে-কথা শিখেছি আর নিজেও বিশ্বাস করেছি, সে-কথাই বলছি। এসব আমার বানানো-কথা নয়; আর, কোন মতলব নিয়েও আমি এসব কথা বলছি না; আপনি বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস করলেই বা কি? লোকটার আশার দুঃসাহস দেখে আশ্চর্য হতে হয়। বিশ্বাস করলেই কি শীলা একেবারে একটা নির্লজ্জ পাগলামি হয়ে এই লোকটার চোখের সামনে তার এই শরীরটাকে একটা বস্তুপিণ্ডের মত রেখে দেবে, আর লোকটার চোখ ও তুলি খুশির মাতাল হয়ে সে শরীরের ছাঁদ এঁকে নেবে?

কলকাতার রাস্তা হলে এই লোকটার এই আহ্লাদের দাবির জবাব ভালভাবে দিতে পারা যেত; পা থেকে স্লিপারটা খুলে নিয়ে…

লোকটা তাকিয়েও আছে অদ্ভুতভাবে। দু'চোখে যেন বুনো লোভের সাধ চিকচিক করছে। যেন একটা ব্যাধ বনের ভেতরে একটা একলা হরিণীকে দেখতে পেয়ে, তার আহ্লাদের সব হিংস্রতা নিয়ে আর শক্ত হয়ে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা বলে—আমার গুরু একটি অদ্ভুত কথা বলতেন; মুখের সুন্দরতা যে মনেরও সুন্দরতার ছবি, এটা সব সময় সত্য নয়। বরং উল্টোটাই অনেক সময় সত্য হয়। মন আর চরিত্র কুৎসিত, অথচ মুখটা সুন্দর। আমার গুরু বলতেন, তিনি এইসব কপট সুন্দরতার মুখ মাত্র একবার দেখেই বুঝে ফেলতে পারেন। কিন্তু…।

লোকটা ফিলসফারের ভাষায় কথা বলছে। কথাগুলি তো শুনতে খারাপ নয়, শুনতে খারাপ লাগছেও না। কিন্তু বলবার দরকার কি? একটা অচেনা-অজানা মেয়ের কাছে এত মুখর হয়ে এসব ফিলসফির কথা বলাও যে একটা মতলবের ব্যাপার।

লোকটা এইবার অদ্ভুতভাবে হেসে ফেলে, আর ফিলসফি ছেড়ে দিয়ে একেবারে অন্য রকমের কথা বলতে শুরু করে।—আপনার কাছে মন খুলে এত কথা বলবার সাহস পেতাম না, ইচ্ছেও হতো না, যদি আপনি আজ হঠাৎ এখানে এভাবে এসে…

শীলা ভ্রুকুটি করে—কি?

—যদি আপনি সাহস না দিতেন।

শীলা—আমি কোন্ দুঃখে আপনাকে সাহস দেব? কি সাহস দিলাম?

—এই যে, খিচুড়ি রাঁধলেন। এরকম একটা জায়গায়, যেখানে শুধু কতগুলো মাছরাঙা ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই, এরকম একটা নির্জনতার মধ্যেও আপনি এখানে রইলেন, আমাকে একটুও সন্দেহ করলেন না। আপনার মত এমন সুন্দর সাহস আর কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না।

প্রশস্তির কবিতার মত ভাষায় কথা বলছে লোকটা। কিন্তু সত্যিই কি কথাগুলি নিতান্ত মিথ্যে কবিত্বের কথা? লোকটা ভণ্ডামি করে কথা বলছে? শীলার আজকের এই সাহসটাকে সুন্দর সাহস বলে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এই লোকটা; অথচ নীহার

রেবা আর জয়া আজ শীলার এই সাহসটাকে যেন নীরবে ধিক্কার দিয়ে চলে গিয়েছে।

বোধহয় শীলার নীরব মুখ আর শান্ত চোখের দৃষ্টিটার মধ্যে একটা সান্ত্বনার ছায়া দেখতে পেয়েছে লোকটা। তা না হলে এইবার একেবারে নিজের জীবনের কথা নিয়ে মুখর হয়ে উঠবে কেন?

—আমি জীবনে এই প্রথম বিশ্বাস করবার প্রমাণ পেলাম, মেয়ে মাত্রই হৃদয়হীন নয়।

—আপনি এসব কথা বলবেন না।

—বলতে দিন। আমি কাউকে অপমান করবার জন্য এ কথা বলছি না। আমার একটা ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে, সব মেয়েই বুঝি শক্ত মনের মানুষ। কিন্তু ধারণাটা যে ভুল, সেটা তো আপনিই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন। আমার মত ভ্যাগাবণ্ডের জীবনে আপনি একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমার ঘর-সংসার নেই; কিন্তু এখানে এই জঙ্গলের এক কোণে পিকনিকের চাল-ডাল আপনি ছুঁয়ে দিয়ে যেন একটা ঘরের মায়ার ছবি তৈরি করে দিলেন। হোক না আধঘণ্টার ছবি, তবু তো ছবি। আর, আমিও ছবি পেয়েই ধন্য। ওর বেশি কিছু দরকার নেই।

শীলার মনের ভিতরে যেন একটা কাকচক্ষু জলের দহ টলমল করে উঠেছে। লোকটার মুখের দিকে তাকালে চোখ দুটোও কেমন যেন টলমল করে উঠতে চায়। এ কি অদ্ভুত অস্বস্তি! লোকটার জন্য যে মায়া হয়। কেন ভ্যাগাবণ্ড হয়ে গেল লোকটার অদৃষ্ট? লোকটার অদৃষ্টের দুঃখটাকে দু-চারটে সহানুভূতির কথা বলে দিয়ে চলে যেতে পারা যায়। আর বেশি শক্ত কথা না বললেও চলবে।

শীলা বলে—যাক, কি আর করবেন! দুঃখ পেয়েছেন, দুঃখটা ভুলে থাকতে চেষ্টা করুন।

—ভুলেই তো আছি। আর আপনার একটি ছবি এঁকে নিতে পারলে, সে দুঃখটা বোধহয় চিরকালের মতই ভুলে যাব।

—আপনি আবার আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করলেন। আমি চলি।

—কিন্তু···। লোকটা হঠাৎ কথা থামিয়ে আর, যেন বোবা হয়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। অদৃষ্টটা যেন চিরকালের মত হতাশ হয়ে গিয়েছে।

শীলা—আর কথা বাড়াবেন না।

—তাহলে সত্যিই আমার ছবি আঁকবার ইচ্ছেটা···

—না।

—কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করেছিলাম···

—কি?

—বিশ্বাস করেছিলাম, আপনার ছবি আঁকবো, আপনি আপত্তি করবেন না, আপনার সে সাহস আছে।

—সাহস?

—হ্যাঁ, আমার ইচ্ছেটাকে একটু দয়া করবার সাহস।

—না, আমার ওরকম কোন বাজে সাহস নেই। আর···

—বলুন।

—আপনারও আর সাহস করা উচিত নয়।

—কি বললেন?

—আমার ছবিকে আপনার চিরকালের ছবি-টবি মনে করা উচিত নয়।

—কেন?

—আমি যে অন্য কারও জীবনের···

—কি বললেন?

—যাক্‌গে; আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমারই ভুল হয়েছে।

—ভুল?

—আজ বাদে কাল একজনের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে,

তার পক্ষে অন্য একজনের কাছ থেকে এসব কথা শুনতে পাওয়া একটা দুর্ভাগ্য।

লোকটা অদ্ভুতভাবে হাসে—তাই বলুন। কিন্তু এ কথা জেনে আমার কোন লাভ হলো না, ক্ষতিও হলো না।

—কি বললেন ?

—আমি তো এমন পাগল নই যে, আপনাকে ভালবাসার কথা বলবো। কিংবা আশা করবো যে, আপনি আমাকে দয়া করে ভালবেসে ফেলবেন।

—আপনি খুবই অভদ্রভাবে কথা বলছেন।

—আচ্ছা চলে যান। বুঝলাম, আপনি আমাকে একটুও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায় শীলা। কিন্তু চমকে উঠেই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। লোকটা নিজের মনে, যেন একলা খুশির মাতালের মত হেসে উঠেছে।

—আমার অবশ্য আপনার ছবি আঁকতে একটুও অসুবিধা হবে না।

—কি বললেন ?

—আপনি চলে গেলেই বা কি আসে যায় ? সবই তো দেখেছি; দু'চোখ ভরে দেখে নিয়েছি। আপনার ছবিটা তো মনের মধ্যে রয়েই গেল।

—আপনি একটা পাগল।

—মিছে কথা নয়। শুধু আপনার ঐ খোঁপা আর খোঁপার ঐ সাদা বুনো ফুল নয়, আপনাকেই আমি এঁকে নিতে পারবো।

—আপনি একটা বুনো অসভ্যতা।

—মিথ্যে কথা নয়। আমার তুলি কোন সভ্যতার, কোন আবর্জনার, কোন শাড়ি-সায়া জামা-টামার ধার ধারে না।

—এখানে পুলিস থাকলে আজ আপনাকে কোমরে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যেত।

—যেত বোধহয়। কিন্তু তাতে আমি ভয় পেতাম না।

কটমট করে তাকায় শীলা।—খুব কৃতজ্ঞতা দেখালেন! একটা মেয়েকে একলা পেয়ে অকারণে খুব অপমান করে নিলেন। আপনি মানুষ বটে!

লোকটার দু'চোখের ঘন-কালো ভুরু যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। ছুটে এসে শীলার কাছে দাঁড়িয়ে আর মাথা হেঁট করে বলে—মাপ করুন। আপনাকে একটুও অপমান করতে চাইনি। আপনাকে···কি জানি কেন···হঠাৎ বড় বেশি ভাল লেগেছিল বলেই বোধহয়—কিংবা হঠাৎ আপনজন বলে মনে হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয়, বড় বেশি দাবি করে ফেলেছিলাম।

যেন স্বপ্নে-পাওয়া একটা ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে লোকটা, কে জানে কোথাকার আর্টিস্ট! কিন্তু চোখ দুটোতে যে সত্যই একটা মুগ্ধতা থম্‌থম্ করছে। শালবনের এক টুকরো নিরিবিলি, সামনে কাকচক্ষু জলের দহ, সাদা পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কলকল স্বরের ঝর্ণা; এখানে লোকটাকেও একটা অপার্থিব আবির্ভাবের মায়া-চেহারা বলে মনে হয়। গাদা গাদা কথা বলে, কিন্তু যেন গুছিয়ে বলতে পারে না; চোখের এই মুগ্ধতাকে বুঝিয়ে দেবার নিয়মটা জানে না। অচেনা-অজানা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার রীতিও জানে না।

ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমি শিক্ষিত মানুষ নই; লেখা-পড়া সামান্যই করেছি। তাই আপনাকে আর্ট বোঝাতে গিয়ে এমন অনেক কথা বলে ফেলেছি, যেগুলি মিথ্যে কথা যদিও নয়···

—বাজে কথা।

—জানি না; আমার গুরু বলতেন, বিবসনা শরীরের ছবিতেই মনের খাঁটি রূপ ফুটিয়ে তোলা যায়। আমারও মনে হয়েছে,

আপনার এই চমৎকার শরীরের একটা খাঁটি ছবি, হুড্রুর ধারার চেয়ে অনেক সুন্দর একটা কান্তিধারার ছবি···

—চুপ করুন।

—আপনি বিশ্বাস করুন ; আপনাকে একটুও অসম্মান করবার জন্যে নয় ; সত্যি কথা বলতে গেলে, বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি···সত্যিই তো, কী চমৎকার একটা অবঞ্চনার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়।

—কি বললেন ?

—অবঞ্চনা। আপনার এই শরীরের ছাঁদটাই বলছে, আপনি আর যা-ই করুন, কারও ভালবাসাকে ঠকাতে পারেন না। সেই-জন্যেই আপনাকে দেখে ছবি আঁকবার জন্য হাত নিসপিস করেছে, যদিও জানতাম, খুব অন্যায় করা হচ্ছে।

ঘন-কালো ভুরু দুটো যেন একটা আনমনা ধ্যানের আবেশে নিবিড় হয়ে যায় ; ভদ্রলোক কি-যেন ভাবছেন।

শীলাও হঠাৎ হাঁপ ছেড়ে, যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভয় থেকে ছাড়া-পাওয়া নিঃশ্বাসের ভার মুক্ত করে দিয়ে কথা বলতে গিয়ে হাসতে চেষ্টা করে।—যাক্‌গে, এসব কথা ছেড়ে দিয়ে, এখন খেয়ে নিন।

ভদ্রলোক—খাব বইকি। এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম একটা নতুন স্বাদের খাবার খাব।

—কি বললেন ?

—হোটেলের রান্না কিংবা চাকরের রান্না, এই খেয়েই তো দুটো বছর পার হয়েছে। আজ একটি অদ্ভুত ভাল-মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে···। বলতে বলতে ভদ্রলোক নিজেও অদ্ভুত ভাবে হাসতে থাকে। —দেশে ফিরে আসার পর এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন মেয়ের হাতের রান্না···

শীলার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন চমকে ওঠে।—দেশে ফিরে আসার পর ?

—হ্যাঁ!

—দেশের বাইরে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—যুদ্ধে। চন্দননগর ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার হয়ে তিন বছর ফ্রান্সে ছিলাম।

শীলার চোখ দুটো কাঁপতে কাঁপতে মুমূর্ষু মানুষের চোখের মত নিভু-নিভু হয়ে আসতে থাকে।

ভদ্রলোক বলে—ভার্দুনের ব্যাট্‌ল্ শুরু হবার আগে একটা অ্যাকশনে হটে আসবার সময় জার্মানদের হাতে বন্দী হতে হয়েছিল।

দুই চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শীলা, যেন হৃৎপিণ্ডটাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রলোক যেন নিজের মনের খুশিতে গড়গড় করে একটা ইতিহাসের বৃত্তান্ত আউড়ে চলেছে।—জার্মানদের বন্দী ক্যাম্পে থাকবার সময়েই গুরু পেয়েছিলাম। একজন ফরাসী বন্দী সোলজার; নাম মার্তিনিয়ে। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। ক্যাম্পের এক কোণে সেই মার্তিনিয়ের সঙ্গে বসে দিন-রাত ছবি আঁকতাম। সেই ফরাসী আর্টিস্টই একদিন বললেন, সুন্দর মুখের রূপেতে অনেক সময় বঞ্চনা থাকে, সুন্দর মুখের ছবি এঁকো না। শুধু সুন্দর দেহের রূপ আঁকতে শেখ, যদি আমার মত ঠকতে না চাও, অবনীশ।

শীলার মাথার উপর যেন অদৃশ্য এক জল্লাদের খড়্গ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখনই দু'টুকরো হয়ে যাবে শীলার শরীরটা।

অবনীশ! আর কেউ নয়; সেই অবনীশ। এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি সেই ভয়াল ছায়া-ছায়া জীবটা তার যত হিংস্রতার নখর তুলে শীলার চোখের সামনে এসে দাঁড়াতো। এত ভয় পেত না শীলা। শীলার হৃৎপিণ্ডের ভিতর তাহলে একরকম ভয়ানক একটা আর্তনাদ ছুটোছুটি করত না।

আর্টিস্ট ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—একি? আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি?…ওকি, ওদিকে কেন ছুটে যাচ্ছেন? ওদিকে যে ভয়ানক একটা খাদ আছে।

পিছু ফিরে তাকাবারও সাহস নেই শীলার। শীলার অন্তরাত্মা যেন মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে। জঙ্গল হোক, ঝোপঝাপ হোক, পাথরের গুহা হোক, কিংবা গাছের কোটর হোক, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়তে চায় শীলা। অবনীশের ছায়া যদি চিতে বাঘের মত ধাওয়া করে ছুটেও আসে, তবু যেন শীলার নাগাল না পায়।

অবনীশও ডাক দিতে দিতে এগিয়ে যেতে থাকে—ওদিকে যাবেন না। ওদিকের নালাতে চোরাবালি আছে।…কিন্তু কি হলো আপনার? এভাবে পালাতে শুরু করলেন কেন?

কিন্তু থামে না শীলা। যেন অবনীশ নামে একটা প্রতিহিংসা উতলা হয়ে শীলাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে। তুলি নয়, বোধহয় ছুরি হাতে নিয়েই অবনীশ আসছে। শীলার এই সুন্দর ছাঁদের চেহারাটার ছবি আঁকবার জন্য নয়; এই চেহারাকে একেবারে নিরাবরণ করে রক্তমাংস লুট করে খাবার জন্য ছুটে আসছে একটা প্রতিশোধ। গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্র নিয়ে দেশে ফিরেছে অবনীশ। চার-বছরের বঞ্চনা সহ্য করেছে অবনীশ, এতদিনের পর এমন একটা সুযোগ পেয়ে সে আজ প্রতিশোধ নিতে ছেড়ে দেবে কেন?

অবনীশ হঠাৎ যেন একটা সন্দেহময় বিস্ময়ের পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে—শীলা।

থমকে দাঁড়ায় শীলা। চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। অবনীশের চোখের দৃষ্টিটা এবার যেন মাতালের চোখের দৃষ্টির মত টলতে থাকে! যেন একটা বুক-ফাটা বিস্ময় সহ্য করতে চেষ্টা করছে অবনীশ—তুমি শীলা? সত্যিই তুমি শীলা?

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে অবনীশ, শীলা নেই।

কিন্তু কোথায় যাবে? এই খাড়াই ধরে ওপরে উঠে গেছে? না, আরও নীচে নেমে গিয়েছে? কিংবা, কোথাও লুকিয়ে পড়েছে?

এরই মধ্যে কোথায় লুকোবে, আর কত দূরেই বা চলে যেতে পারবে শীলা?

অবনীশ এগিয়ে যায়।

হারানো সোনা খুঁজে খুঁজে হয়রান আর হতাশ হয়ে যাবার পর যদি কেউ হঠাৎ দেখতে পায় যে, সেই সোনা হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে, তখন তার নিশ্চিন্ত তৃপ্তির হাসির সঙ্গে একটা লজ্জাও ফুটে ওঠে।

অবনীশের চোখে কিন্তু করুণ বিস্ময়, আর মুখে বেদনা। অবনীশের জীবনের প্রথম প্রীতির পিপাসা, স্বপ্নের প্রথম আশা, সেই শীলা কি সত্যিই এতক্ষণ ধরে অবনীশের চোখের এত কাছে ছিল? ছিল যদি, তবে পালিয়ে গেল কেন? এত ভয় পেল কেন?

ভাবতে একটু আশ্চর্যই লাগে; অবনীশ আর শীলা, দুই জীবনের মধ্যে একটা চোখে-দেখার সম্পর্কও দেখা দিতে পারেনি; কিন্তু মনে মনে যে একটা গিঁট পড়েছিল; শান্ত অঙ্গীকারের গিঁট। যুদ্ধের কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে অবনীশ দেশে ফিরে এলেই শীলার বিয়ে হয়ে যাবে।

চন্দননগরে সামান্য একটা চায়ের দোকান করে সামান্য একটা একলা জীবনকে আশাহীন করে দিয়ে অবনীশের দিনগুলি একরকম কেটেই যাচ্ছিল। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, পরেশবাবু হঠাৎ এসে অবনীশের মনের সেই আশাহীন কুঠুরীটার ভেতর যেন একটা দীপ জ্বেলে দিলেন।—আমার এক ভাইঝি আছে, অবনীশ।

এখন জামসেদপুরে ওর এক মামার কাছে আছে, ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছে। কিন্তু···একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে অবনীশ।

—সমস্যা ?

—হ্যাঁ। শীলার, তার মানে আমার ঐ ভাইঝির মামা মারা গেছেন। শীলার বিধবা মামী অগত্যা তার ছেলেপুলে নিয়ে তার এক ভাইয়ের কাছে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। কিন্তু মামীর ভাই তার টানাটুনির সংসারে শীলার মত একটা গলগ্রহ সহ্য করতে রাজী নয়। কে-ই বা রাজী হয় বল, অবনীশ ?

অবনীশ—হ্যাঁ, ভদ্রলোক না হয় নিজের বিধবা বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীর বোঝা ঘাড়ে নিলেন, কিন্তু বোনাইয়ের ভাগ্নীকেও ঘাড়ে বইতে রাজী হবেন কেন ? রাজী হলে অবশ্য ভাল ছিল !

পরেশবাবু—অগত্যা··· ।

অবনীশ—বুঝেছি, অগত্যা আপনারই ঘাড়ে···তা আপনার তো রাজী হওয়া উচিত ; আপনি হলেন কাকা।

পরেশবাবু—অসম্ভব অবনীশ। আমার নিজেরই ঘরের উনুনে কোনদিন দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে কিনা সন্দেহ। আমি কি ওরকম একটা ধিঙ্গি মেয়ের জীবনের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে পারি ?

অবনীশ—নিলে ভাল ছিল।

পরেশবাবু হঠাৎ বলে ওঠেন—তুমিই নাও না অবনীশ ?

অবনীশ—আমার মত মানুষের পক্ষে ওসব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে না নেওয়াই উচিত।

—কেন ?

—একটা মেয়েকে বিয়ে করে আনবো কি তাকে শুধু কষ্ট দেবার জন্যে ? চায়ের দোকান করে যা রোজগার হয়, তাতে আমার নিজেরও যে দিন ভাল চলে না।

—ভেবে দেখ অবনীশ। মেয়েটি দেখতেও ভাল।

—কি বললেন ?

পরেশবাবু দু'চোখ কুঁচকে আর চোখের তারা দুটোকে তীব্র করে নিয়ে অবনীশের মুখটার দিকে তাকান; যেন অবনীশের বুকের ভিতরে ছটফটিয়ে ওঠা একটা লোভী পিপাসাকে দেখছেন।

মেয়েটি দেখতে ভাল; এই একটি কথার আবেদন যেন এরই মধ্যে ছেলেটার মনে রঙ ধরিয়ে দিয়েছে: নিঃশ্বাসগুলিকে এলোমেলো করে দিয়েছে।

উপায় নেই পরেশবাবুর। অবনীশকে রাজী করানোই পরেশবাবুর আজকের এই ব্যস্ততার আসল ইচ্ছা। কোনমতে রাজী করাতেই হবে, তাছাড়া যে আর কোন উপায়ই নেই। পরেশবাবু জানেন, শীলা আর ক'দিন পরে পরেশবাবুরই এই ভয়ানক অভাবের জীবনের উপর দুর্ভর একটা বোঝা হয়ে বসবার জন্য জামসেদপুর থেকে চলে আসবে। চিঠি দিয়েছে শীলা। এ মেয়ের খাওয়া-পরা যোগাবেন কেমন করে পরেশবাবু? তা ছাড়া, এ মেয়ের বিয়ে? ওরকম একটা ধিঙ্গি কালো মেয়েকে বিয়ে করবেই বা কে? টাকা খরচ করলে হয়তো সাধারণ একটা কেরানী ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারা যেত। কিন্তু টাকা কই? দপ্তরীর কাজ করে পরেশবাবুর যে মাসে দশ টাকাও হয় না। শীলার খুড়ি অনেকদিন আগেই মরে বেঁচেছে; আর পরেশবাবুকেও অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছে; একটাও ছেলে-পুলে রেখে যায়নি শীলার খুড়ি।

অবনীশকে রাজী করাতেই হবে। কোনমতে বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর বুঝবে ওরা আর ওদের ভাগ্য। সুতরাং যদি সামান্য একটা মিথ্যে কথাকে একটু সুন্দর করে বলে দিয়ে, শীলার মত কুরূপা মেয়েকে বেশ সুরূপা বলে ব্যাখ্যা করে যদি অবনীশের মনে একটা লোভের হাওয়া বইয়ে দিতে পারা যায়; তবে ··তাছাড়া যে কোন উপায়ও নেই।

পরেশবাবু বলেন—মেয়েটি যেমন স্বাস্থ্যবতী, তেমনি সুন্দর গড়ন, আর মুখটিও তেমনি, চমৎকার একটি ঢলঢলে মুখ।

অবনীশ—কিন্তু আমার যে সাহস হয় না পরেশকাকা।

—কেন?

—এ মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন কেন? আমার সঙ্গে যে একটুও মানাবে না।

—কেন? তুমি তো দেখতে একটুও খারাপ নও।

—সে কথা নয় কাকাবাবু। আপনার ভাইঝিকে খুশি হয়ে বিয়ে করতে আমার চেয়ে শতগুণ ভাল অবস্থার ছেলেও যে রাজী হয়ে যাবে।

—হতে পারে। কিন্তু আমি যে তাতে রাজী নই।

—কেন?

—আমার যে তোমাকেই পছন্দ। তোমার জন্য আমার মনে, কে জানে কেন, কেমন একটা মায়া আছে অবনীশ।

—তাহলে···

—আর অত ভেব না অবনীশ। রাজী হয়ে যাও।

—আমি রাজী আছি পরেশকাকা। কিন্তু···

—আবার কিন্তু কেন?

—আগে আমি একটা চাকরি-টাকরি ধরি।

—তাহলেই হয়েছে। চাকরির আশায় বসে থাক।

—না কাকাবাবু, আশা আছে, কিন্তু বসে থাকতে হবে না।

—কি চাকরি?

—যুদ্ধের চাকরি।

—অ্যাঁ?

—চাকরির চিঠি পেয়েছি, কিন্তু ভাবছিলাম, নেব কি না। এখন তো দেখছি···

—যুদ্ধের চাকরি মানে তো বিদেশে যেতে হবে।

—হবে নিশ্চয়।

—তাহলে তো সেই অবস্থাই দাঁড়ালো। তুমি বিদেশে গিয়ে

বন্দুক চালাবে, আর মেয়েটা ততদিন আমারই ঘাড়ে বোঝা হয়ে···

—না না, আমার স্ত্রী আপনার ঘাড়ের বোঝা হবে কেন ? আমি টাকা পাঠাবো। যতদিন না দেশে ফিরে আসি ততদিন...

—হ্যাঁ, ততদিন একেবারে নিয়ম করে টাকা পাঠাবে তো অবনীশ ?

—নিশ্চয়।

—বিয়েটা তবে···এটা হলো ভাদ্র। কাজেই এ কটা মাস বাদ দাও। অগ্রাণে তো হতে পারে।

—হ্যাঁ।

ঠিকই, চাকরিটা পেতে অসুবিধা হয়নি অবনীশের। আগেই খবর পেয়েছিল অবনীশ; এ যুদ্ধে বাঙালীকেও সোল্‌জার করে নিতে চাইছে গভর্নমেণ্ট। প্রথম বাঙালী রেজিমেণ্ট যেদিন মেসোপটেমিয়া রওনা হয়ে গেল, সেদিন স্টেশনে গিয়ে বাঙালী সোল্‌জারের সেই ট্রেনও দেখে এসেছিল অবনীশ। চন্দননগর থেকেও একটা বাঙালী ব্যাটালিয়ন ফ্রান্সে পাঠাবার আয়োজন চলছে। রিক্রুটিং শুরু হয়েছে। দরখাস্ত করেছিল অবনীশ। আর চিঠি পেতেও দেরি হয়নি, এখনি ভর্তি হও।

কিন্তু হাবিলদার হয়ে ব্যাটালিয়নে ভর্তি হয়েই চন্দননগর ছাড়তে হলো। পণ্ডিচেরীতে গিয়ে ছ'মাসের ট্রেনিং; তারপরেই ফ্রান্সের ডাক। ব্যাণ্ড বাজিয়ে জাহাজটা যখন ছাড়ছে, তখন অবনীশের মুখে বিষাদের ছায়া নয়, বরং একটা তৃপ্তির সুখ যেন ঝলমল করে ওঠে।

বিয়ে হয়নি; বিয়ে হতে পারলো না; বিয়ের সুযোগই হয়নি। ছুটি পায়নি, ছুটি পাওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু পরেশবাবুকে চিঠি দিয়েছে অবনীশ; আর প্রতিশ্রুতিও রেখেছে। ফ্রান্সে রওনা হবার আগের মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ত্রিশটি টাকা পরেশবাবুর নামে পাঠিয়েছে অবনীশ। পণ্ডিচেরীতে থাকতেই পরেশবাবুর চিঠি পেয়েছে অবনীশ, শীলা এসেছে। জামসেদপুর থেকে চন্দননগরে এসে এখন

পরেশবাবুর কাছেই আছে শীলা। আর, বেশ মন দিয়ে লেখাপড়া করছে; আই-এ পরীক্ষা দিতে চায় শীলা।

অবনীশও একটি চিঠিতে পরেশবাবুকে তার খুশি মনের ব্যাকুলতার কথাগুলিকেও স্পষ্ট করে লিখে দিতে পেরেছে, দেখবেন, শীলা যেন কোন কষ্ট না পায় পরেশকাকা। পড়ার খরচের জন্য যদি আরও টাকা দরকার হয়, তবে আপনি ধার-টার করে চালিয়ে দেবেন। আমি আশা করছি, ফ্রান্সে পৌঁছে প্রতি মাসে অন্তত একশো টাকা পাঠাতে পারবো।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের সেনাবারিক, কিংবা ফ্রন্ট লাইনের ট্রেঞ্চ, কিংবা জার্মানীর বন্দী-শিবির—যেভাবে আর যেমন করেই দিনগুলি কেটে যাক না, অবনীশ যেন জাগা চোখেও স্বপ্ন দেখেছে, একটি ঢলঢলে সুন্দর মুখের ছবি যেন দিগন্তের বুকে এক নিরালায় অবনীশের অপেক্ষায় জেগে বসে আছে। জার্মানদের হাতে বন্দী হবার আগের মাস পর্যন্ত, তিন বছর ধরে প্রতিমাসে চন্দননগরের একটা ক্ষুদ্র সংসারের কাছে টাকা পাঠিয়েছে অবনীশ। তার মানে টাকা এসেছে; ফর্ম সই করে কম্যাণ্ড অফিসে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল অবনীশ; তার প্রাপ্য সব টাকা যেন চন্দননগরের পরেশবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে চিঠিও দিয়েছে অবনীশ—আশা করি আপনি ভাল আছেন, আর শীলার কোন কষ্ট হচ্ছে না নিশ্চয়।

এ যুদ্ধ থামবে কবে? মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ বন্দী-শিবির থেকে ছাড়া পাব কবে? প্রাণটা মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে উঠেছে। দেশে ফিরে যাবার পর আর দেরি করবার দরকার হবে না। চন্দননগরের একটি ঘরের নিভৃতে একটা শুভ উৎসবের প্রাণ এখনও আরও কিছুদিন অপেক্ষার দুঃখ সহ্য করবে; অবনীশ দেশে ফিরে গেলেই সেই উৎসবের প্রাণ শাঁখ বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে; সুন্দর একটি ঢলঢলে মুখকে নিজেরই বুকের কাছে দেখতে পাবে অবনীশ।

দেশে ফিরে এসে কিন্তু সেই সুন্দর ঢলঢলে মুখটির কোন খোঁজ পায়নি অবনীশ। পরেশবাবু মারা গিয়েছেন। আর, তাঁর ভাইঝি কলকাতায় চলে গিয়েছে।

বন্দী-শিবিরের ছ'টা মাসের জীবনটা প্রচণ্ড এক অবরোধ আর নির্বাসনের বেড়ার আড়ালে পড়েছিল। ঠিকই, চিঠি দিতে পারেনি অবনীশ, কোন চিঠিও পায়নি অবনীশ। কল্পনাও করতে পারেনি যে, চন্দননগরের সেই ঘরের বুকটা খালি হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় চিঠি লিখেছিল শীলা ; আমি যে আজ একলা হয়ে গেলাম ; কোথায় তুমি ? কবে আসবে ? জানিয়ে দাও, এখন কোথায় যাব আমি। সে চিঠি বোধহয় বারুদের ধোঁয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল, কিংবা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পরেশবাবুর তালাবন্ধ ছোট্ট মাটির ঘরটার দিকে তাকিয়ে এই কথাই ভেবেছিল অবনীশ।

কিন্তু কোথায় গেল শীলা ? কলকাতার পথে পথে ঘুরে কত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়েছে অবনীশ। ঢলঢলে সুন্দর মুখ খুব কমই চোখে পড়েছে। খোঁজ করে তাদের পরিচয়ও জেনেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ শীলা নয়। তারা হলো যত সিপ্রা হিমানী অপর্ণা আর মাধুরী। উকিলের মেয়ে, ডাক্তারের মেয়ে, প্রফেসরের ভাগ্নী আর থিয়েটারের অভিনেত্রী।

খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল অবনীশ—তুমি কোথায় আছ জানি না। আমি ফ্রান্স থেকে ফিরেছি। খোঁজ দাও।

বিজ্ঞাপনে শীলার নামটা দিতে গিয়েও কি-যেন ভেবেছিল অবনীশ। সারা মুখে একটা যন্ত্রণার জ্বালাও যেন ফুটে উঠেছিল। ভাবতেও যে বুকটা চমকে ওঠে। তবু নামটা না দেওয়াই ভাল। হতেও পারে, শীলা আজ এক ভদ্রলোকের ঘরের আনন্দ হয়ে, স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে আর হাসছে। শীলাকে নাম ধরে ডাকা উচিত নয়। বিজ্ঞাপন পড়ে শীলার স্বামী বেচারা হয়তো সন্দেহ করে চমকে উঠবে, আর শীলার অবস্থাটাও বিপদে পড়বে।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর মোট তিনটে বছর পার হয়েছে। পল্টনের চাকরিও আর নেই; সেই পল্টনও ভেঙে গেছে। চাকরিহীন জীবনটা একেবারে নিরর্থক হয়ে গিয়ে আর উপোস করে এই তিন বছরের মধ্যেই বোধহয় শেষ হয়ে যেত, যদি সাহেবের বাগানের মালীর কাজটা না পাওয়া যেত।

শীলার খোঁজ পাওয়া গেল না। আর পাওয়া যাবেও না। হয় শীলা মরে গেছে, নয় কারও ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু শীলা যে মরে যায় নি, হঠাৎ এ খবরটা একদিন জানতে পারে অবনীশ। শীলার মামীর ভাই, জামসেদপুরের জিতেনবাবু জানিয়েছেন; তিন মাস আগেও কলকাতার রাস্তায় শীলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। শীলা কলকাতারই একটা মেয়ে-স্কুলের টিচার। কিন্তু কোন্ স্কুল, কেমন স্কুল, আর কোথায় যে সেই স্কুল, সে-সব কিছুই জানেন না জিতেনবাবু।

কিন্তু জানতে কি আর কিছু বাকি রইলো? অবনীশের বিজ্ঞাপনের ব্যাকুলতার কাছে ধরা দিতে চায় না শীলা। শীলার কাছে অবনীশ আজ নিতান্ত একটা মিথ্যা।

কিন্তু ঢলঢলে সুন্দর মুখটা যে একটা নির্মম বঞ্চনা। মানুষের আশাকে এত অপমান করতে পারে, এত ঠকাতে পারে যে, তাকে সেই ভীরু গরীব পরেশ দপ্তরীর ভাইঝি বলেও বিশ্বাস করতে পারা যায় না। সেই আধ-পাগলা ফরাসী সোল্‌জার, সেই আর্টিস্ট মার্তিনিয়ে বলেছিল—সুন্দর মুখকে বিশ্বাস করো না অবনীশ। সুন্দর মুখ মানেই বঞ্চনা। ভালবাসতে যদি চাও, তবে সুন্দর শরীরকে ভালবাসবে। তবে ঠকতে হবে না।

তখন হেসে ফেলেছিল অবনীশ। আধ-পাগলা মার্তিনিয়ের কথাগুলিকে পুরো পাগলের কথা বলে মনে হয়েছিল। মনে হবেই বা না কেন? অবনীশের বুকের ভিতরে তখন যে সুন্দর একটি মুখের ছবিই ঢলঢল করছে।

পঞ্চাশ টাকা মাইনে, শৌখীন সাহেবের গার্ডেনার অবনীশ ফুল ফোটাতে জানে, ফুল ফোটাতে ভালবাসে। কিন্তু অবনীশের ভালবাসার চোখ দুটোও বদলে গিয়েছে। ফুলগুলি সুন্দর মুখ নয়, সুন্দর শরীর। ছবি আঁকতে হাতের তুলি ব্যাকুল হয়ে শুধু শরীরের ছবি আঁকে ; সুন্দর শরীরের ছবি। শৌখীন সাহেবও হেসে হেসে ধমক দিয়েছেন—তুমি একটু বেশি অশ্লীল ছবি আঁকছ গার্ডেনার। এ ছবি আমাদের ক্লাবের কোন মেম্বার কিনতে রাজী হবেন না।

অবনীশ বলে—আমি কিন্তু বিক্রী করবার জন্যে ছবি আঁকি না স্যার।

—তবে ? কিসের জন্য ?

—এটা স্যার আমার একটা সান্ত্বনা। শুধু এঁকেই খুশি হই।

সাহেব হাসেন—তুমি হয় লুনাটিক, নয় লাভার।

অবনীশ—আই অ্যাম বোথ, স্যার !

কিন্তু যে মেয়ে এরকম দুটো আতঙ্কের চোখ তুলে একবার তাকিয়ে নিয়েই ছুটে পালিয়ে গেল, সে মেয়ে কোন শীলা হলেও সেই শীলা হবে কেমন করে ? ঐ মুখ তো সুন্দর ঢলঢলে মুখ নয়।

তার চেয়ে বেশি আশ্চর্যের কথা ; ঐ মেয়েকে হঠাৎ শীলা বলে চেঁচিয়ে ডাক দিল কেন অবনীশ ? কি দেখে ? কি মনে করে ? কি সন্দেহ করে ? কোন্ প্রমাণ পেয়ে ? ডাকটা যে বুকের ভিতর থেকে একটা মূর্খ ব্যাকুলতার মত আপনি উথলে উঠেছে ?

কিন্তু কোথায় গেল ঐ মেয়ে ?

অনেক দূর চলে এসেছে শীলা। হাঁপ ছেড়ে একটু জিরিয়ে নেয়। এখানে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকালে শুধু একটা-দুটো মাছরাঙাকে উড়তে দেখা যায় ; আর কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু ভুল করে একটা অন্য পথে চলে এসেছে শীলা। এটা একটা

খাড়াই পথ। নীহার জয়া আর রেবা যেখানে আছে, সেই কালো-পাথর, শিশুগাছের ছায়া আর কসমসের ঝোপগুলিকে এদিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে না।

ছায়া-ছায়া যে ভয়টা পিছু পিছু তাড়া করে আসছিল, সে কি থেমেছে? সে কি সত্যিই কিছু বুঝতে পেরেছে? বুঝতে পারলে সে আর থেমে থাকবে না। তুলি হাতে নিয়ে নয়, সেই কাঠি-কাটা বড় ছুরিটাকে হাতে নিয়েই ছুটে এসে শীলার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে।

কি কৈফিয়ৎ দেবে শীলা? কি বলেই বা এই প্রতিহিংসাকে বোঝাবে? বোঝাতে না পারলে সে আজ শীলাকে ক্ষমা করবেই বা কেন?

কাকার সঙ্গে একদিন ঝগড়া করেছিল শীলা—তুমি ভদ্রলোককে মিথ্যে কথা কেন বললে কাকা?

পরেশবাবু—মিথ্যে কথা না বললে অবনীশ তোকে বিয়ে করতে রাজীই হতো না।

শীলা—কিন্তু এর পর কি হতে পারে ভেবে দেখেছ?

—কি হতে পারে?

—দেশে ফিরে এসে যখন দেখবে ভদ্রলোক, আমার চেহারাটা এত কুৎসিত, তখন কি সে আর আমাকে বিয়ে করবে? আর তুমিই বা তাকে কি বলে বোঝাবে? তোমাকে যে একটা ঠগ জোচ্চোর বলে গাল দেবে।

পরেশকাকা হাসেন—শুধু আমাকে কেন, তোকেও কি কিছু বলতে ছেড়ে দেবে অবনীশ?

কেঁদে ফেলে শীলা—তবে এ কাণ্ড করলে কেন?

পরেশবাবু—এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না শীলা। তোকে তো বাঁচাতে হবে।

শীলা—বেঁচে তো আছি ঠিকই। ভদ্রলোকের টাকায় বেঁচে আছি। কিন্তু···

পরেশবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—এর পর আর কিন্তু-টিন্তু করবার কোন মানে হয় না। অবনীশ দেশে ফিরে এসে যদি তোকে বিয়ে করতে রাজী না হয়, তবেই বা ভয় কিসের ? তুই একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে নিবি। আর আমিও তার মধ্যে এক ফাঁকে পটল তুলে ফেলবো। অবনীশের রাগ কারও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

হঠাৎ চুপ করে আর মুখটাকে একেবারে করুণ করে নিয়ে কাকা আরও একটা কথা বলেছিলেন—খুবই ভাল হয়, যদি অবনীশ দেশে ফিরে এসে তোকে খুশি হয়ে, না হয় অন্তত দয়া করে, বিয়ে করে। কে জানে, ভগবান কি ঘটাবেন।

অবনীশের দয়া মায়া আর আশার প্রতিনিধি হয়ে প্রতি মাসে টাকা আসছে। দিন চলে যাচ্ছে। এক একটি স্বাচ্ছন্দ্যের দিন। কিন্তু শীলার প্রাণটা যেন একটা আতঙ্কের ছায়া দেখছে। প্রচণ্ড এক কৈফিয়তের দিকে শীলার জীবনের মুহূর্তগুলি যেন এগিয়ে চলেছে। সে একদিন আসবে, আর এসেই দেখবে যে, এই শীলা তার কল্পনার সেই ঢলঢলে সুন্দর মুখের শীলা নয়। সে তখন শীলার কাছ থেকে ফুলের মালা দাবি করবে না, দাবি করবে টাকা। অবনীশ নামে একটা নিদারুণ হতাশা গর্জন করে উঠবে—আমাকে ঠকালে কেন তুমি ? তুমি যে এত কুৎসিত, সে-কথা পরেশবাবু মিথ্যা-কথা বলে চাপা দিলেও তুমি চাপা দিলে কেন ? তুমি তো একটি চিঠিতে শুধু একটি কথায় আমাকে জানিয়ে দিতে পারতে যে, তুমি কুৎসিত। না, পরেশবাবুর ভাইঝিকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি সুদ সমেত প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো।

ভাগ্যটাকে এই পরিণামের জন্য তৈরি করে রাখবার মত শক্তি পেতে চায় শীলা। যেন সেই কৈফিয়তের দিনে একটুও বিচলিত না হয়ে বলতে পারে শীলা, নাও প্রতিশোধ।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে সুন্দর একটি মিষ্টি-হাসির মূর্তি এসে যেন শীলার সেই আতঙ্ক, সেই অপমানের ভয়, আর কুরূপ হওয়ার

এই ভীরুতার গ্লানি সব ধুয়ে-মুছে দিয়ে শীলার বিষণ্ণ প্রাণটাকেই নতুন আশ্বাসের বাতাস দিয়ে হাসিয়ে দিল।

আজও ভুলতে পারা যায় না, প্রথম দিনের সেই বিস্ময়, নিতান্ত এক আকস্মিকের উপহারের মত যে বিস্ময় শীলার চোখের কাছে একটা মুক্তির ছবি তুলে ধরেছিল।

দরজার বাইরে কাকার সঙ্গে কে-যেন কথা বলছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল শীলা; চমৎকার একটি মিষ্টি-হাসির চেহারা, মুখটা যেন অদ্ভুত রকমের করুণ, কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

কাকা ঘরের ভিতরে এসে অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন—পোড়া-কপাল আর কাকে বলে!

—কি হলো?

—তা না হলে আমার মত মানুষের কাছেও টাকা ধার করতে কি কেউ আসতে পারে?

—ভদ্রলোক টাকা ধার চাইছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কলেজের মাইনে দিতে হবে, তা না হলে লেখা-পড়া বন্ধ করে দিতে হবে।

—কি পড়েন ভদ্রলোক?

—বললে তো এম-এ পড়ে; কোলকাতায় একটা মেসে থাকে।

—তোমার কাছে এলেন কেন?

—ঠিক আমার কাছে আসেনি; এসেছিল ঐ···ও বাড়িতে, ওর মামা জগৎবাবুর কাছে। কিন্তু মামা টাকা দেননি।

—কিন্তু তোমার কাছে কেন?

—জগৎবাবু বলেছেন, আমি নাকি হঠাৎ গুপ্তধন পেয়েছি। সুতরাং, আমার কাছে এসে টাকা চাইতে পরামর্শ দিয়েছেন জগৎবাবু।

—ছিঃ!

—যাই হোক। ছেলেটি বলছে, গোটা তিরিশ টাকা যদি…

—না না; তুমি বাজে লোকের কথায় কান দিও না কাকা।

—ঠিক কথা। কিন্তু কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

—বলে দাও, টাকা দিতে পারবো না।

—তুই বলে দে শীলা। স্পষ্ট করে বলে দে। আমি ভীতু মানুষ, আমার পক্ষে এখন আর…

দরজার কাছে এগিয়ে যেয়ে শীলা বলে—আপনি টাকা চেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু…হঠাৎ নীরব হয়ে যায় শীলা। কে যেন শীলার মুখের উপর হাত চেপে দিয়ে বলছে, ছিঃ, এত নিষ্ঠুর ভাবে কথা বলতে নেই। অভাবের মানুষের আশার সঙ্গে এত কঠোর আচরণ অন্তত তোমাকে মানায় না।

শীলা বলে—খুব দরকার?

—হ্যাঁ।

ফিরে এসে বাক্স খুলে তিরিশটা টাকা কাকার হাতে তুলে দিয়ে শীলা বলে—দিয়ে দাও।

একটা মাসও পার হয়নি; চন্দননগরের স্টেশনেই সেই মিষ্টি-হাসির মানুষটির সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়েছিল শীলার। শীলাকে দেখতে পেয়েই সে-মূর্তির চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিস্ময়ে নিবিড় হয়ে গিয়েছিল।

স্টেশনের সেই ভিড়ের মধ্যেই শীলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কত স্পষ্ট স্বরে, একটুও কুণ্ঠা না রেখে, শীলাকে যেন বন্দনা করে বলে গেল সেই মিষ্টি চেহারার মানুষটা।—তোমাকে ভুলে থাকতে পারছি না। কোনদিন ভুলে যেতে পারবো না। তোমার প্রাণটা কত সুন্দর সেটা তো সেদিনই দেখেছি। তারপর বুঝেছি, তার চেয়ে বেশি সুন্দর তুমি।

শীলার মত একটা বাজে চেহারার মেয়েকে একটা সুস্বপ্নের ছবির মত সুন্দর বলে মনে করেছে অমন একটি মিষ্টি-হাসির আর সুন্দর চেহারার মানুষ? ভদ্রলোক সত্যিই কি ইচ্ছে করে কতগুলো মিথ্যে কথার তামাশা দেখিয়ে গেল? জগৎবাবুর ভাগ্নে কি একটা মিথ্যে স্তাবকতার প্রাণ? ওর চোখ দুটো কি দুটো কপটতার চোখ? বিশ্বাস করতে পারে না শীলা। বিশ্বাস করতে ভাল লাগে না।

কিন্তু কলকাতা থেকে দিনের পর দিন এতগুলি যে চিঠি এল, সেগুলি শীলার কানের কাছে কি-কথা বলেছিল?

সব কথার মধ্যে এই সত্যই ফুটে উঠেছে; শীলার জীবনের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে বসে আছে একটা দাবি। ভালবাসার দাবি। শীলার কথা জীবনে ভুলতে পারবে না একটা কৃতজ্ঞতা। এম-এ পাশ করে একটা কাজ ধরতে পারলেই শীলাকে আর চন্দননগরের ও-বাড়িতে পড়ে থাকতে দেবে না একটা উৎসব। শীলার মত মেয়ে স্ত্রী হবে যার, সে স্বামী যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী স্বামী হবে! জগৎবাবুর ভাগ্নে পরেশবাবুর ভাইঝির কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, বিনিময়ে নিজের অদৃষ্টটাকেই উপহার দিয়ে ফেলেছে।

এক-মাস দু'মাস নয়, প্রতি মাসেই কলকাতার মেসের ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে শীলা যেন তার সৌভাগ্যের এই সুন্দর ছবিটারই সব ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাবিকে সাহায্য করেছে। বছরের পর বছর পার হয়েছে। কাকাও জগৎবাবুর কাছে শুনেছেন, তাঁর ভাগ্নে এম-এ পাস করেছে। কিন্তু এখনও কোন ভাল কাজ জোগাড় করতে পারেনি।

কাকা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, জগৎবাবুর ভাগ্নের কাছে শীলা কেন টাকা পাঠায়। প্রতিবাদ করেন না কাকা। শুধু একদিন যেন আতঙ্কিতের মত দুটো ম্লান চোখের দৃষ্টি তুলে বললেন—আমার কেন যেন বেশ ভয়-ভয় করছে শীলা।

কাকার মনের ভয় ভেঙেছিল কিনা কে জানে। কাকা তো পৃথিবীর সব ভয়ের ওপারে চলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু শীলার প্রাণটা যে ভয়ের ছায়া দেখে চমকে ওঠে। আর কতদিন কবে একটা চাকরি পাবে জগৎবাবুর ভাগ্নে; আর শীলার জীবনটা ভয়ের ছায়ার গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে নিরাপদ হয়ে যাবে।

কাকা মরে যাবার ঠিক দুটো মাস আগে যুদ্ধ-অফিস থেকে শীলার নামে কোন মনি-অর্ডার আসে নি। আশ্চর্য হয়েছিল শীলা; কিন্তু আরও আশ্চর্য, শীলার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা বদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের ভীরু বাতাস মুক্ত হয়ে গিয়ে শীলার সব আতঙ্কের জঞ্জাল উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

যুদ্ধ-অফিস থেকে আর কোন চিঠিও আসে না। না আসুক, বুঝতে অসুবিধে নেই, অবনীশ আর টাকা পাঠাবে না। অবনীশই বোধহয় নেই। মানুষটা বোধহয় ফ্রান্সের বারুদের ধোঁয়ার মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে।

ঘটনাটাকে বুঝতে গিয়ে বুকের সব নিঃশ্বাসকে যেন পাথর করে নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। চোখ ফেটে দর্‌দর্‌ করে একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট অপরাধের কান্নার জলও ঝরে পড়েছিল। কিন্তু উপায় নেই। অবনীশ বেঁচে থাকলেও যে সে আজ শীলার জীবনের আশা নয়। অবনীশ শীলাকে বিয়ে করতে চাইলেও যে শীলা রাজী হতে পারবে না।

কলকাতার মেয়ে-স্কুলের চাকরিটাও যেন শীলার ভাগ্যের এই সন্ধিক্ষণে বন্ধুর মত হাত এগিয়ে দিয়ে ডাক দিল। না, আর ভয় নেই। অবনীশের প্রেতচ্ছায়াও প্রতিশোধ নেবার জন্য শীলাকে খুঁজে পাবে না। চন্দননগর থেকে কলকাতার মেয়ে-স্কুলের হোস্টেলে এসে ঠাঁই নিয়ে যেদিন হাঁপ ছাড়ে শীলা, সেদিনই দেখা করতে এসেছিল সে, যে আজ শীলার অদৃষ্টের সৌভাগ্য, শীলার আশার প্রতিশ্রুতি; শীলার ভালবাসা।

স্কুলের মেয়ে-পড়ানো একটা চাকরি কতই বা মাইনে; কিন্তু প্রতি মাসে সে মাইনের চারভাগের তিনভাগ এখনও মেসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হয়। তা না হলে শীলারই ভালবাসার মানুষ যে কষ্ট পাবে। এখনও যে সে কোন চাকরি জোগাড় করতে পারে নি। সকাল-বিকেল চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে শীলা; সে-জন্য ভুলেও শীলার মনে কোন মুহূর্তে একটা আক্ষেপও বাজে না। সে মানুষ যেন চা-খাবার খেতে পায়। প্রতি মাসে আরও পাঁচ টাকা পাঠাতে হবে, সে মানুষ যেন হেঁটে-হেঁটে হয়রান না হয়; ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা করতে পারে।

হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করুণা মাসিমা জানেন, কার কাছে টাকা পাঠায় শীলা। কেন পাঠায়?

মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন করুণা মাসিমা—ভালয় ভালয় ছেলেটির এখন একটি ভাল চাকরি হয়ে যায়, তবেই ভাল। তোমার অবস্থা দেখতে আমার একটুও ভাল লাগছে না শীলা।

শীলা চুপ করে হাসে। করুণা মাসিমা বলেন—আমি বলি, বিয়েটা হয়েই যাক না শীলা। চাকরি-টাকরি তো একদিন হবেই।

শীলা—শুধু আমার ইচ্ছেতেই তো হবে না মাসিমা। তার ইচ্ছে, আগে চাকরি হোক, তারপর বিয়ে।

করুণা মাসিমা—সেটা মন্দ ইচ্ছে নয়। তবে···কথাটা কি জান? বেশি দেরি ভাল দেখায় না।

যে-বছর রেবা নীহার আর জয়া—তিন নতুন টিচার এসে হোস্টেলে ঠাঁই নিল, সে-বছরে শীলা কিন্তু মাত্র দু'বার সেই মিষ্টি-হাসির মানুষটাকে চোখে দেখেছে আর কথা বলেছে। পূজোর ছুটির প্রথম দিনে একবার, আর গুডফ্রাইডের ছুটির দিনে একটিবার। নীহার রেবা আর জয়া করুণা মাসিমার ধমক খেয়েও চুপ করে বসে থাকতে পারে নি; ভিজিটর্স রুমের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে

শীলাদির জীবনের বাঞ্ছিত সেই চমৎকার হাসির মানুষটিকে দেখেছে। সত্যি চমৎকার চেহারা।

কিন্তু···যেমন করুণা মাসিমা, তেমনিই নীহার রেবা আর জয়াও আশ্চর্য হয়, এখন তবে আর দেরি করছেন কেন ভদ্রলোক? শীলাদি তো কিছুই চাপা রাখেন নি। সেদিনও স্পষ্ট করে বলেছে, হ্যাঁ, বেশ ভাল একটা কাজ পেয়েছেন ভদ্রলোক, যে কাজ এতদিন শুধু ইংরেজ সাহেবেরাই পেয়ে এসেছে; সে-কাজে এই প্রথম ইণ্ডিয়ান অফিসার হলেন শীলাদির উনি, যিনি একদিন শীলাদির স্বামী হবেন।

শীলাদির ধৈর্য আছে বলতে হবে। পুরো একটি বছর পার হয়ে গেল, সে-ভদ্রলোক এর মধ্যে একটি দিনও শীলাদির সঙ্গে আর দেখা করতে আসেন নি। বোধহয় দু'তিনটে চিঠি শুধু এসেছিল। কিন্তু গত ছ'মাসের মধ্যে কোন চিঠিও আসে নি।

তবু শীলাদি বেশ আছে। সব চেয়ে বেশি হাসে শীলাদি, সব চেয়ে বেশি দুরন্তপনা করে শীলাদি। শীলাদির কল্পনায় যেন এখনও একটা গর্ব হেসে রয়েছে; শীলাদি দেখতে যা-ই হোক, শীলাদির ভালবাসার মানুষ যে···যেমন দেখতে চমৎকার তেমনিই মানে-সম্মানে আর টাকা-পয়সায় চমৎকার। সাতশো টাকা মাইনে পান ভদ্রলোক। তবে শীলাদির মনে একটু গর্ব থাকবেই বা না কেন? আয়নাতে মুখ দেখতে চায় না শীলাদি, ওটাও যে একটা গর্ব; যেন বলতে চায় শীলাদি, যে মুখটাকে আয়নাতে দেখতে ইচ্ছে করে না, সেই মুখই তো অমন চমৎকার একটি মানুষের ভালবাসা জয় করে বসে আছে। সে মুখে এখন স্নো-পাউডার না মাখলেও চলে।

কোন মুহূর্তেও কি শীলার মনে নতুন করে কোন ভয়ের ছায়া দেখা দেয় না? কলকাতার মেস থেকে আর চিঠি আসবার কথা নেই। সে এখন মেসে থাকে না। সে এখন ফোর্টের একটি নিভৃতের একটি ঘরে থাকে। আর ফোর্টেরই ভিতরে একটি অফিসে কাজ করে। যুদ্ধের প্রকাণ্ড একটা রিপোর্ট লেখা শুরু হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান আর্মি কোথায় কোন্ কোন্ দেশে, কি-ভাবে কত যুদ্ধ আর কীর্তি করেছে, তারই বিবরণ। বিশ ভল্যুমে সমাপ্ত হবে এই বিবরণ। শেষ চিঠিতে শুধু এইটুকু জেনেছে শীলা, সে এখন চীফ কমপাইলারের ফার্স্ট অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে কাজ করছে। কিন্তু···কিন্তু এত বড় সৌভাগ্যের লিপিটাকে হাতে পেয়েও যেন বিশ্রী একটা প্রশ্ন শীলার মনের ভিতরে ঘুর ঘুর করে। কেন এতদিনের অপেক্ষা আর ধৈর্যের প্রাণটা তবু খুশি হয়ে হেসে উঠতে পারছে না ?

না, সন্দেহটাকেই বিশ্বাস করতে পারে না শীলা। অসম্ভব ! ঐ চমৎকার মিষ্টি-হাসির মধ্যে কোন ছলনা থাকতে পারে না। চন্দন-নগরের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সেই অদ্ভুত রকমের করুণ-সুন্দর মুখের ছবিতে কোন স্বার্থের চক্রান্ত ছিল না।

হ্যাঁ, শেষ চিঠিতে স্পষ্ট করে একটা আশ্বাসের কথাও যে ছিল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না শীলা ; ঠিক সময় বুঝে আমি নিজেই যাব। চিঠি যদি না পাও, তবে জানবে আমি খুবই ব্যস্ত আছি।

না, আর কিছু বলবার নেই। আর কিছু করবারও নেই। ঐ ব্যস্ততা যেদিন নিজেই ইচ্ছে করে ফুরিয়ে যাবে, সেদিন যদি···হ্যাঁ, তার আগে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে কোন অপেক্ষার মানুষকে দেখবার সুযোগ আর দেখা দেবে না। দেখাই যাক, ঐ ব্যস্ততার অবসান কবে হয় ?

শুকনো ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে হরিয়াল ঘুঘুটা। বটের পাতার আড়ালে যে এক-জোড়া হরিয়াল বসে ছিল, তারই একটা হলো এটা। আর-একটা মরেছে কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কারণ সেটা যে কোন্ দিকে উড়ে চলে গেল, কতদূরে গেল, আর কোথাও ঝুপ করে লুটিয়ে পড়লো কিনা, দেখতে পায়নি কুমুদ।

হরিয়ালটার গায়ের কাঁচা রক্ত ভাল করে শুকোয়নি, কিন্তু যেন বেতারে খবর পেয়ে দশ মিনিটের মধ্যে তিন সারি কালো পিঁপড়ে পৌঁছে গিয়েছে। আরও আসছে। মরা হরিয়ালটার গা বেয়ে অনেক পিঁপড়ে উঠছে আর নামছে।

কুমুদ বলে—শঙ্করদা একটু বেশি ক্যাবলা মানুষ। প্রেস্টিজ সম্বন্ধে সামান্য একটা হুঁশও নেই।

বরুণা বলে—জামাইবাবু বরাবরই ওইরকমের। যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে, আর এক মিনিটের মধ্যেই একেবারে গলাগলি ভাব জমিয়ে বসেন।

কুমুদ—সেই কথাই তো বলছি। এতে অসুবিধা হয় আমার। আমাকে আমার প্রেস্টিজের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলে দুর্নাম রটে যেতে পারে।

বরুণা হাসে—জামাইবাবুর মনে কিন্তু এসব ভয়ের বালাই নেই। তা না হলে চাপরাসীর মেয়ের বিয়েতে গিয়ে

আশ্চর্য হয়ে তাকায় কুমুদ—চাপরাসীর মেয়ের বিয়েতে ?

বরুণা—হ্যাঁ, বিয়ে দেখতে গেলেন আর এক গাদা গোলা লোকের সঙ্গে এক লাইনে বসে ভাত খেয়েও এলেন।

কুমুদ—এর পর কি চাপরাসীর কাছে শঙ্করদার প্রেস্টিজ বলতে কিছু থাকতে পারে ?

—তা জানি না। কিন্তু ওভাবেই তো বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন দেখছি।

—একদিন ঠেকে যেতে হবে।

—সেদিন বোধহয় ভুল বুঝবেন।

—তবে একটা কথা, শঙ্করদার একটা সুবিধে আছে, যে-জন্য এসব কাণ্ড করে উনি সেরে যেতে পারছেন।

—কিসের সুবিধে ?

—উনি হলেন ব্যবসায়ী মানুষ। যদি আমার মত অফিসার

হতেন, তবে বুঝতেন, প্রেস্টিজের ব্যাপারে এত ক্যাবলা হলে চলে না।

—যাক্‌গে ওসব কথা।

—হ্যাঁ,···ঠিক কথা, আমি এসব কথা নিয়ে আজ আর এখানে বসে মাথা ঘামাতাম না ; কিন্তু···আমার ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে, শঙ্করদা এখনও একটা বাজে লোককে তাঁবুর কাছে বসিয়ে গল্প করছেন।

বরুণা হাসে—এতক্ষণে হয়তো মুর্গীর কারি-টারি খাইয়ে লোকটাকে তোয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য নয়। আর, শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে জান ?

—কি ?

—শঙ্করদার পকেট থেকে কিছু খসবে !

—কেন ?

—এ ক্লাসের লোক এসে যখন স্যার-স্যার করে, তখনই বুঝতে হবে যে, কিছু টাকা আদায় করবার মতলবে এসেছে।

—তা অভাবের মানুষদের স্বভাবে ওরকম একটু-আধটু···

—না বরুণা। অভাব থাকলেই যে স্বভাবটাকে ভিখারী করে তুলতে হবে, এটা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। তা যদি হতো তবে আমি আর···।

—কি ?

—আমার জীবনের সব গল্পই তো তোমাকে মুক্তকণ্ঠে বলে দিয়েছি বরুণা। আমিও একদিন অভাবের মানুষ ছিলাম কিন্তু কোন দিন ভুলেও কারও কাছে হাত পাতিনি। নিজের মনের জোরে আর প্রাণের জোরে খেটেছি আর লেখাপড়া শিখেছি।

বরুণাও খুশি হয়ে হাসে।—বাবা তো এই জন্যেই তোমাকে এত···

বরুণার একটা হাত ধরে বরুণাকে যেন বুকের কাছে টানতে চায় কুমুদ—বল বরুণা, থামলে কেন ?

—এই জন্মেই তোমাকে এত পছন্দ করেন বাবা।

ঠিকই বলেছে বরুণা; একটুও বাড়িয়ে বলেনি। রামদয়ালবাবু, ছোটনাগপুরের প্রায় প্রত্যেক শহরে যাঁর সাতটি-আটটি বাড়ি আছে, বাড়িওয়ালা বিত্তবানদের মধ্যে বলতে গেলে যিনি অদ্বিতীয়, তাঁর দুই মেয়ে অরুণা আর বরুণাকে তিনি তাঁর সম্পত্তি সমান দু'ভাগে ভাগ করে দান করে দিয়ে যাবেন। কারণ, তাঁর ছেলে নেই। তিনি শুধু চান যে, জামাইরা যেন এই দানের সম্মান রাখতে পারে। রামদয়ালবাবু তাঁর এই প্রবীণ জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু দেখেছেন, এবং এই শিক্ষাও পেয়েছেন যে, জামাই যদি একটু শক্ত চরিত্রের মানুষ না হয়, তবে মেয়েকে দেওয়া সম্পত্তি দুদিনে উচ্ছন্ন হয়ে যায়। যতীনবাবুর, সাতকড়িবাবুর এমন কি মিস্টার কাইজারেরও সম্পত্তি এই ভুলে নষ্ট হয়ে গেছে। ওঁদের মেয়েরা অবশ্য খুবই সাবধান ছিল; কিন্তু হলে হবে কি? জামাই-গুলো ছিল মেরুদণ্ডহীন অথচ লোভী। মেয়েগুলোকে নানাভাবে বিরক্ত করে, নানা কারসাজি করে, কেঁদে সেধে অভিমান করে, শেষে সব সম্পত্তি এলোমেলো করে আর উড়িয়ে দিয়ে হতচ্ছাড়া হয়ে গেল। নিজেদের সম্বন্ধে যদি একটা সম্মানবোধ থাকতো, তবে শ্বশুরের দেওয়া স্ত্রী-সম্পত্তিকে ওভাবে লুটেপুটে খেতে ওরা লজ্জা বোধ করতো।

কুমুদ ছেলেটি কিন্তু বেশ শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ। দেখে শুনে আর জেনে খুশি হয়েছেন রামদয়ালবাবু। মনে হয়, কুমুদ ছেলেটি বড় জামাই শঙ্করের চেয়েও স্বভাবে বেশি সাবধান, আর মনের দিক দিয়েও বেশি মজবুত। কেউ এসে হাত পাতলেই মন গলে যাবে আর পকেট থেকে কিছু বের করে দেবে, এটা কুমুদের স্বভাব নয়। কুমুদের মুখ থেকেই শুনেছেন রামদয়ালবাবু—আমি ওভাবে চ্যারিটি করে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিই না। আমি আমার ছেলেবেলার জীবনে শত অভাবেও কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও

কারও কাছে মাথা নীচু করিনি। সাহায্যের জন্য কারও কাছে হাত পাতিনি। আমি এম-এ পড়বার সময় হাওড়া স্টেশনে খবর-কাগজ ফিরি করেছি, আর তিনটে ছাত্র পড়িয়েছি। আমি নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি। কোন কাকা-মামা-পিসে-মেসোর দয়ার ধার ধারিনি।

—এই তো চাই, এই তো চাই! খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন রামদয়ালবাবু। আর বরুণা, ভিতরের ঘরের একটি সোফার উপর বসে সে-কথা শুনতে পেয়ে একটা নিশ্চিন্ত আনন্দের উথলে পড়া হাসি চাপতে গিয়ে ছটফটিয়ে হেসে উঠেছিল। না, এরপর আর ভাবনা করবার কোন মানে হয় না। এর চেয়ে আর বেশি স্পষ্ট করে কি-ই বা বলবেন বাবা! কুমুদকে মনে ধরেছে; বরুণা আর কুমুদের মেলা-মেশাকে এখন আর কোন সমস্যা বলে মনে করবেন না বাবা।

কোথায় যেন একটা হরিয়াল ঘুঘু ডাকছে। যেন একটা ভীরু দীর্ঘশ্বাসের কূজন। কুমুদ বলে—তোমার বাবা তো আমাকে পছন্দ করেছেন, আর, কেন যে পছন্দ করেছেন, তাও বুঝতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কেন আমাকে এত ভালবেসে ফেললে বরুণা? আমি সত্যিই···।

বরুণা—কি?

কুমুদ—আমি যে ভাবতেই পারি নি, তুমি আমাকে এত ভালবেসে ফেলবে।

বরুণা হাসে—তুমি যে আমারই মনের কথাটা বলে ফেললে।

কুমুদ—অঁ্যা?

বরুণা—সত্যি, আমিও বুঝতে পারিনি কুমু, এত শিগগির···

কুমুদ—এত শিগগির? এ কথাটা কিন্তু ঠিক কথা হলো না বরুণা। পুরো দুটো বছর কি একটা শিগগির ব্যাপার হলো?···ওঃ, আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম বরুণা।

—কেন ?

—এই দু'বছরের মধ্যে এই সেদিন ··তার মানে, তোমার বাবার সেই প্রথম স্ট্রোকের দিনে সন্ধ্যাবেলাতে তোমার মুখ থেকে প্রথম একটি ছোট্ট কথায় বুঝতে হলো যে, না, আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি।

ঠিকই, রামদয়ালবাবুর হার্টের কষ্টটাও সেদিন যেন হঠাৎ নিঝুম হয়ে গেল। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিছানার উপর নীরব ও নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন রামদয়ালবাবু। কুমুদকে দেখতে পেয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিল বরুণা—কি হবে ? কি হবে কুমু ?

কুমুদ—সেরে উঠবেন তোমার বাবা, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।

বরুণা—আমার হাত ধরে বল কুমু।

কুমুদ সাগ্রহে বরুণার একটা হাত ধরে বলেছিল—নিশ্চয়ই, আমি বলছি, আমার বিশ্বাস, তোমার বাবা সেরে উঠবেনই।

হরিয়ালের সেই চাপা দীর্ঘশ্বাসের কূজন আর শোনা যায় না। বরুণা বলে—মনের সন্দেহটা চলে গিয়েছিল, তাই সেদিন হাত ধরতে পেরেছিলাম।

—সন্দেহ ?

বরুণা হাসে—না, ঠিক সন্দেহ নয়। প্রশ্ন।

—কিসের প্রশ্ন ?

—মনে হয়েছিল, তোমার মনে কি কোন মেয়ের স্মৃতির ছায়া নেই ? তুমি কি এতই সাদা ?

—ছি ছি ছি ! এত অদ্ভুত প্রশ্নও তোমার মত মেয়ের মনে··· তাছাড়া, আমার মত একটা মনখোলা মুখখোলা মানুষকে দু'বছর ধরে চোখে দেখেও যদি···

—না, আর কোন প্রশ্ন নেই।

—তুমি আর একবার আমার বুকে হাত রেখে বল বরুণা ; এরকম বাজে বিশ্রী মিথ্যে অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার মনে আর নেই।

কুমুদের বুকের উপর মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়ে আর নরম রঙীন ঠোঁট দুটোকে যেন নিবিড় এক পিপাসায় কাঁপিয়ে দিয়ে বরুণা বলে—না, সে প্রশ্নই মিথ্যে হয়ে গেছে।

কুমুদ বলে—আমারও মন থেকে একটা দুঃস্বপ্নকে তুমি মুছে দিলে বরুণা। আমার ভালবাসা যদি তোমার একটা মিথ্যে প্রশ্নের কাছে অপমানিত হতো, তবে আমাকে বোধহয় দেশছাড়া হয়ে কোথাও চলেই যেতে হতো। কিন্তু···

বরুণা—কি ?

কুমুদ—তোমার সেই মিথ্যে প্রশ্নটা কিন্তু তোমার মনের একটা ভীরুতা।

বরুণা—ভীরুতা কেন হবে ?

কুমুদ—তুমি কেন ওসব কথা ভাববে ? তুমি যদি আমাকে ভালবেসে থাক, আর আমি যদি তোমাকে ভালবেসে থাকি, তবে সেটাই তো সব প্রশ্নের শেষ। তারপর আর আমার মনে এমন প্রশ্ন দেখা দেবেই বা কেন, তোমার জীবনে কোনদিন কারও জন্য কোন আশার ছায়া পড়েছিল কি না···

বরুণা—না।

চমকে ওঠে কুমুদ; বরুণা যেন একটা উদ্ধত দর্পের মত বেশ শক্ত স্বরে কথাটা বলেছে।

বরুণা—না; আমার জীবনে যদি কারও ভালবাসার কোন দাগ থাকতো, তবে আমি তোমার মুখের দিকে ভুলেও তাকাতাম না। সে অহংকার আমার আছে।

বরুণার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে কুমুদ।—আমারও মনে সে অহংকার যথেষ্ট আছে বরুণা।

বরুণা হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হয়ে হাসে - সেই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে ভাগ্যটাকে মিলিয়ে দিতে চাই কুমু। জেদ বল, কুসংস্কার বল, আর ভীরুতাই বল, ওটা আমার আছে। আমি এমন কাউকে

ভালবাসতে পারি না, যার মনে অন্য কোন মেয়ের ভালবাসার স্মৃতির ছাপ আছে ; এমন কি···

কুমুদের অপলক চোখ দুটো যেন থেমে থেমে শিউরে উঠতে থাকে।—কি ?

বরুণা—এমন কি, যদি এমন হতো যে, তুমি কোন মেয়েকে সত্যিই ভালবাসনি, অথচ সে-মেয়ে তোমাকে ভালবেসেছে, তবু···

—অ্যাঁ ?

—তবু আমার পক্ষে আপস করা সম্ভব হতো না কুমু।

—কি বললে ?

—তুমি বলবে ভীরুতা ; কিন্তু আমি বলবো সাবধানতা। দরকার কি, এমন কোন মানুষের ভালবাসা পেয়ে, যাকে অন্য মেয়ে ভালবেসেছে ? এতটা অসাবধান হতে পারলে দু'বছর আগে মীরাটের পরাগ সেনের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে যেত। তুমি তো জান···।

—বেশি কিছু জানি না, পরাগ সেন তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এটুকু জানি। কিন্তু তুমি যে···

বরুণা হাসে—ভয় নেই ; মিথ্যে কথা বলবো না। পরাগ সেনকে পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই করি নি। কিন্তু বাবা খুব পছন্দ করেছিলেন।

কুমুদ—কিন্তু, তবু কেন···।

বরুণা—তবু আমিই বিয়ে করতে রাজী হই নি। কারণ, আমি শুনেছিলাম, একটি গুজরাটি মেয়ে নাকি পরাগ সেনকে ভালবাসে। আর পরাগ সেন বেচারা সে মেয়েকে একটুও পছন্দ করে না।

কুমুদ—পরাগ সেন বোধহয় ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিল।

বরুণা—মোটেই নয়। জামাইবাবুর কাছে নিজেই গল্প করে সব বলে দিয়েছিল পরাগ সেন। ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলবার মত ভীরু মানুষ নন।

কুমুদ চেঁচিয়ে ওঠে—আমিও···একটি কথা তোমাকে আমি বেশ

গর্ব করে জানিয়ে দিতে পারি বরুণা, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই! আমি পাগল হয়ে গেলে হয়তো মানুষ খুন করতে পারবো, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।

বরুণা—আমি বিশ্বাস করি কুমু; এই বিশ্বাস আছে বলেই তো আমি দিদি আর জামাইবাবুর চোখের সামনেই হেঁটে হেঁটে তোমার সঙ্গে এখানে চলে আসতে পেরেছি। আর কিসের চক্ষুলজ্জা? বাবাও এখন দেওঘরের বাড়ির বারান্দায় বসে হয়তো ভাবছেন, কবে বিয়েটা হবে।

কুমুদ—হ্যাঁ, আমিও তো ভাবছি।

বরুণা—আমিও।

কুমুদ—এ মাসেই তো হতে পারে।

বরুণা—হতে পারে। বাবারও বোধহয় তাই ইচ্ছে।

কুমুদ—কেমন করে জানলে?

বরুণার মুখের উপর যেন একটা চকিত বিদ্যুতের হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হাতের ব্যাগটা খুলে একটা চিঠি বের করে কুমুদের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় বরুণা—পড়ে দেখ। তোমাকে দেখাবার জন্যই এ চিঠিকে সঙ্গে রেখেছি।

বরুণার কাছে লেখা চিঠি নয। রামদয়ালবাবু অরুণার কাছে লিখেছেন—এইবার কুমুদের সঙ্গে বরুণার বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল হয়। এ মাসে হলেই ভাল। আমারও আর এভাবে অনিশ্চিত হয়ে থাকা উচিত নয়; শরীরের যা অবস্থা, কখন ডাক এসে পড়বে বলা যায় না। কুমুদের সম্পর্কে আমার আর কিছু বলবার নেই। কুমুদকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এবার আমার সম্পত্তি দু'ভাগ করে তোমাদের দু'বোনের নামে লিখে দেবার ব্যবস্থা করছি! নিশ্চিন্ত হয়েছি, কুমুদ ছেলেটি যেমন শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ, তেমনই সত্যবাদী। আমার বিশ্বাস আছে, বরুণার সম্মান আর সম্পত্তি দুইই কুমুদের হাতে নিরাপদ থাকবে।

চিঠিটাকে বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে কুমুদ, হাতটা অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কুমুদ—আমার ইচ্ছে করছে বরুণা, তোমার বাবাকে এখনই টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিই, কুমুদ ছেলেটাকে তিনি আর যাই ভাবুন, যেন কোন ভুলেও, পাগল হয়ে গেলেও, কুমুদকে মিথ্যেবাদী বলে না মনে করেন।

বরুণা হাত বাড়িয়ে চিঠিটাকে কুমুদের হাত থেকে তুলে নিয়ে আবার ব্যাগের ভিতরে রাখে।—তোমাকে আর এত ব্যস্ত হয়ে ওরকম অহংকারের টেলিগ্রাম করতে হবে না।···চল, ঐ পাথরটার কাছে গিয়ে একটু বসি।

অদৃশ্য হরিয়ালের দীর্ঘশ্বাসের সেই চাপা-চাপা কূজন আবার বাজতে শুরু করেছে। এগিয়ে যেতে থাকে কুমুদ আর বরুণা।

চমকে ওঠে বরুণা—দেখ দেখ !

কুমুদ—কি ? কোথায় ?

বরুণা—ঐ যে ! কি চমৎকার একটা মেয়ে ? সাঁওতাল মেয়ে বোধ-হয়। কত বড় একটা সাদা বুনো ফুল খোঁপাতে ঝুলছে।

কুমুদের হাতের রাইফেল থরথর করে কাঁপতে থাকে।

বরুণা বলে—কি আশ্চর্য, মেয়েটা কি-রকম অদ্ভুতভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছ ?

কুমুদ বিড়বিড় করে—তুমি ওর দিকে তাকিও না বরুণা।

বরুণা—কেন ? কিসের ভয় ?

কুমুদ—ভয় মানে এই যে···কে জানে কেন···কোন্ মতলব করে হঠাৎ এভাবে···জঙ্গলের একটা প্রেতিনীর মত···

বরুণা খিলখিল করে হেসে ওঠে—কি ছাইপাঁশ বকছ। সত্যিই ভয় পেলে নাকি ? এতবড় পদস্থ অফিসার—হাতে আবার রাইফেলও আছে, সে-মানুষ হঠাৎ এসব আবার কি বলতে শুরু করল ?

কুমুদ হাসতে চেষ্টা করে।—তা নয়, ওসব কিছু নয় ; কিন্তু ভয়ানক একটা মিসচিফ তো হতে পারে।

বরুণা—কখ্‌খনো না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি…

কুমুদের গলার স্বর শিউরে ওঠে—কি, কি বললে ? তুমি স্পষ্ট করে আবার কি দেখতে পেলে ?

বরুণা—আমার মনে হয়, মেয়েটা একটা শিক্ষিতা মেয়ে।

চমকে ওঠে কুমুদ—অঁ্যা ? তুমি ভয়ানক বাজে কথা বলছ বরুণা।

বরুণা—না। আমার মনে হয়, একজন আদিবাসী খ্রীষ্টান মেয়ে। দেখছ না, কি-রকম চমৎকার স্টাইলে শাড়ি পরেছে ?

একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে কুমুদ—তা হতে পারে। হতে পারে কেন, ঠিকই বলেছ। কোন খ্রীষ্টান ওরাওঁ মহিলা।

বরুণা—উনিও বোধহয় পিকনিকে এসেছেন।

কুমুদ—তাই তো মনে হয়। যাই হোক, তুমি এখন তাহলে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে…

বরুণা—তুমি কোথায় যাবে ?

কুমুদ—আমি একটু ওদিকে ঘুরে আসি ; জঙ্গলের ভেতরের দিকে। হয়তো খরগোস-টরগোস পাওয়া যেতে পারে।

বরুণা—দরকার নেই।

কুমুদ—কিন্তু আমার দরকার আছে। শুধু ছোট্ট একটা হরিয়াল মেরে আমার রাইফেলের ক্ষিদে মিটছে না। একটু বড়-গোছের প্রাণী, একটু বেশি রক্ত, একটু বেশি…

কুমুদের চোখ-মুখ যেন একটা দুরন্ত শিকারের পিপাসায় ছটফট করছে ; যেন চোখে-মুখে কাঁচা রক্ত মাখতে চাইছে ফোর্টের অফিসার কুমুদবন্ধু।

বরুণা—এরকম করছ কেন ? সামান্য একটা খরগোস শিকার করবার জন্য একেবারে বাঘের মত একটা আক্রোশ নিয়ে ..

বলতে বলতে হেসে ফেলে বরুণা—তোমাকে বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে কুমু্।…ও কি ? মহিলা কোথায় চলে গেলেন ?

হ্যাঁ, সেই মহিলা, শিক্ষিতা আদিবাসী মহিলার মত দেখতে সেই হঠাৎ-আবির্ভাবের মূর্তিটা যেন অতিকায় পাথরটাকে আড়ালে রেখে আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। চকিতে একবার দেখতে পাওয়া গেল, খোঁপাতে একটা সাদা ফুল নিয়ে একটা মাথা যেন শালের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বরুণা—মহিলা ওভাবে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেন ?

কুমুদের দু'চোখের ভুরু দুটো আরও কুঁচকে গিয়ে দুটো শিশু কালো-সাপের কুণ্ডলীর মত আস্তে আস্তে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ—তুমি তাঁবুতে চলে যাও বরুণা।

বরুণা—তুমি ?

কুমুদ—আমি ওদিকে একবার যাব।

বরুণা– কোন্ দিকে ?

কুমুদ—ঐ যে, ঐ মহিলা যেদিকে গেলেন।

বরুণা—কেন ?

কুমুদ—মনে হচ্ছে, ভয়ানক কোন রহস্য আছে।…আমার একটা কর্তব্য আছে বরুণা। আমি যাই…এখনি তাঁবুতে ফিরে আসবো।

বলতে বলতে রাইফেলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড একটা কৌতূহলের বাঘের মত ছুটে চলে যায় কুমুদ।

কৌতূহলের বাঘ একেবারে নিথর হয়ে একটা বুক-উঁচু পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আর শুধু মাথাটাকে উপরে তুলে রেখে, আর দু'চোখ অপলক করে দেখতে থাকে।

পাথরটার উপর নিকটের চারটে শালের ছায়া লুটিয়ে পড়ছে ;

তাই সেই ছায়ার সঙ্গে চোরা শরীরটাকে লুকিয়ে রাখবার সুযোগটাও বেশ ছায়া-ছায়া হয়ে আছে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুমুদ। ঐ তো, কেমন শান্ত আর সুস্থির হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে শীলা। শীলার চোখের সামনে শ্যাওলা-মাখা নুড়ি আর পাথরগুলি ছড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে আছে। তার পরেই প্রপাতের ধারা। গুঁড়ো গুঁড়ো জল ছিটকে পড়ছে; বাতাসে ছুটোছুটি করছে সেই গুঁড়ো জলের কণা। কি-ভয়ানক জলের তোড়। যেন কোথাও একটা পাথুরে দানবের ফাটা বুকের গহ্বর থেকে একটা গলগলে বন্যার রাগ উথলে উঠেছে; প্রচণ্ড আক্রোশের শব্দ তুলে নীচের পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে প্রপাতের সেই পাগল জলের ধারা।

ভাল, দেখতে ভালই লাগে। আত্মহত্যা করবার জন্য প্রপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে শীলা। কুমুদের চোখ দুটো যেন একটা আশ্বাসের দৃশ্য দেখছে। ঐ ভয়ংকর প্রতিশোধের নারী এখন যদি ভালয়-ভালয় ঐ পাগল-জলের প্রপাতের উপর একটা মরণ-ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে কুমুদের জীবনের শত্রু একটা ভয়ানক অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কোন সন্দেহ নেই, ঐ কুৎসিত মুখের মানুষ, একটা টিচার নারী আজ ইচ্ছে করলে কুমুদের জীবনের আশার কুঞ্জটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। বেশি কিছু নয়, শুধু বরুণার কাছে যদি একটা চিঠি লিখে দেয়, যদি কুমুদের পুরনো চিঠিগুলির ভেতর থেকে যে-কোন একটা চিঠিকে তুলে নিয়ে বরুণার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তবেই কুমুদের ভরসার পৃথিবীটা এক নিমেষেই মিথ্যে হয়ে যাবে। কুমুদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেই মুহূর্তে সরে যাবে ঐ বরুণা, ভেনাসের মুখের ছাঁদের মত যার মুখের ছাঁদ; আর, ফোটা গোলাপের পাঁপড়ির মত যার ঠোঁটের রঙ। আর, সম্পত্তিময় একটা প্রতিশ্রুতিও যে ছাই হয়ে যাবে। রামদয়ালবাবুর হাউস-প্রপার্টির অর্ধেক অংশ শুধু নিদারুণ একটা ভ্রুকুটির ছায়াকে

কুমুদের অদৃষ্টের কাছে রেখে দিয়ে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যাবে। কুমুদের জীবনটা যে একটা আবর্জনা হয়ে যাবে।

শীলাকে একবার ডাক দিয়ে বলে দিতে পারা যায়, যাক্, তোমার আর ওভাবে এই হুড্রুর জলে মরণ বরণ করবার দরকার নেই। চার বছর ধরে যত টাকা তুমি আমাকে দিয়েছ, তার একটা হিসাব দাও। আমি সে টাকার ডবল টাকা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান; আমার ক্ষতি করবে না। প্রতিজ্ঞা কর, আমার ক্ষতি করবে না। প্রতিজ্ঞা কর, বরুণার কানে কোনদিন সেই চার বছরের ঘটনার একটা গল্পও পৌঁছবে না।

না, ঐ ভয়ানক নারীর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেলেই বা কি? তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না। কুমুদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আতঙ্কে ভরে থাকবে। শীলার হাতে যতদিন কুমুদের একটি চিঠিও থাকবে, ততদিন শীলার হাতে কুমুদের জীবনকাঠি থেকে যাবে। তার চেয়ে ভাল···হ্যাঁ খুব ভাল, এভাবে চুপচাপ হুড্রুর জলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শেষ হয়ে যাক কুমুদের জীবনের ঐ ভয়।

ও কি! হাসছে কেন শীলা? শীলা কি ওর পায়ের কাছের ছোট্ট জলকুণ্ডটার বুকের আয়নাতে ওর মুখের হাসির ছবিটাকে একবার দেখে নিচ্ছে? দেখে নিক তাহলে; মরে যাবার আগে ওর ভয়ানক ভুলটাকে একবার বুঝে নিক। কুমুদের মত মানুষ ওর মত ওরকম একটা বাজে চেহারার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, এরকম একটা বাজে সুস্বপ্ন দেখা যে কত বড় ভুল করা হয়েছে, সেটা আজ বুঝে ফেলুক। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করুক। কুমুদকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করবার দুঃসাহস যেন আর না হয়।

কিন্তু না, ফিরে আসছে শীলা। পাগল জলের বুকে মরণ-ঝাঁপ দিল না! আস্তে আস্তে হেঁটে, আর কুৎসিত মুখের উপর সেই অদ্ভুত হাসিটাকে যেন আরও জ্বলজ্বলে করে নিয়ে কুমুদের অদৃষ্টের ভয়টা এদিকেই আসছে।

আসুক তাহলে। কুমুদের রাইফেল-ধরা হাতের হাড় যেন কড়কড় করে বাজতে থাকে। বাঘের কৌতূহলটা এবার যেন সাপের আক্রোশের মত ফণা তুলে কাঁপছে; কাঁপতে থাকে কুমুদের চোখ। না, উপায় নেই; হরিয়াল ঘুঘুর চেয়েও দুর্বল ঐ মেয়ের প্রাণ যেন আর ডাক ছাড়তে না পারে, এখনই ওকে চিরকালের মত নীরব করে দেওয়াই ভাল।

—শীলা!

শালের ছায়ার আড়াল থেকে পাথরটা যেন গর্জন করে উঠেছে। থমকে দাঁড়ায় শীলা। আর, কুমুদের হাতের রাইফেলটা যেন একটা দুর্বার পিপাসা চাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে কেঁপে উঠতে থাকে।

শীলা বলে—বল।

উত্তর দেয় না কুমুদ। কুমুদের বুকের ভিতরে যেন একটা সাপের নিঃশ্বাস দুলছে।

হেসে ফেলে শীলা।—ভুল করছ। তোমার হাতের রাইফেলকে শান্ত কর।

—কি? কুমুদের গলার স্বরটা যেন একটা ক্ষিপ্ত হিংস্র প্রতিধ্বনির টুকরোর মত বেজে ওঠে।

শীলা—ধরা পড়ে যাবে। রাইফেলের শব্দ সকলেই শুনতে পাবে।

—কি? আবার ক্ষিপ্তস্বরে প্রশ্ন করে কুমুদ।

শীলা—আজ এখানে তুমি ছাড়া আর কারও হাতে বোধহয় বন্দুক নেই। কাজেই বন্দুকের শব্দ হবে, গুলি খেয়ে মরা একটা মেয়েমানুষের লাসও পাওয়া যাবে; তখন তুমি পার পাবে কেমন করে? তোমারই কাছে যে কৈফিয়ৎ চাইবে পুলিস।

কুমুদের হাতের মুঠোটা হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়, রাইফেলটাও এলিয়ে পড়ে।

শীলা হাসে—তার চেয়ে ভাল, চুপচাপ চলে যাও।

কুমুদ—যেতে পারি, যদি তুমি নিশ্চিন্ত করে দাও। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে বলতে হবে, তুমি আমার ক্ষতি করবে না!

—ক্ষতি ?

—হ্যাঁ। তুমি আমার আর বরুণার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ বাধাবে না।

—আমার কোন গরজ নেই।

—কি বললে ?

—ও কাজ করবার আগে যে আমি ঘেন্নায় মরে যাব।

—এটা ভাল কথা। কিন্তু···

—কি ?

—আমি বলতে চাই···

—বল।

—কথা হচ্ছে···সব চেয়ে ভাল হতো···অর্থাৎ তোমার এখন উচিত ছিল···

হেসে ফেলে শীলা।—কথাটা স্পষ্ট করে বলে ফেলতে পারছ না কেন? আমার পক্ষে আজ হুড্রুর পাগল জলে একটা মরণ-ঝাঁপ দিয়ে ফুরিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, এই তো ?

—তুমি ভেবে দেখ।

—তুমি বল, তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে তো ?

—হ্যাঁ।

—তবে তাই হবে।

—তোমার কথায় কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

কুমুদের চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা চোর নেকড়ের অভিসন্ধির আবেদন। শীলার জীবন্ত চেহারাটাকে যেমন সহ্য করতে পারছে না কুমুদ, তেমনই শীলার এই ভয়ানক অঙ্গীকারকেও নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বস করতে পারছে না।

শীলা—কেন নিশ্চিন্ত হতে পারছ না ?

কুমুদ—হুড্রুর এই পাগল-জলে ঝাঁপ দিয়ে মরলেও তোমার লাসটা আমাকে বিপদে ফেলতে পারে ?

শীলা—তার মানে ?

কুমুদ—ধর, কেউ যদি সন্দেহ করে, আমিই তোমাকে জলে ঠেলে দিয়েছি, তবে ?

—এই কথা ! হেসে ফেলে শীলা।

চোর নেকড়ের হিংস্র চোখের মত কুমুদের চোখেও একটা অভিসন্ধির আবেদন জ্বলতে থাকে। কুমুদ বলে—তবে তুমি একটা কাগজে লিখে দাও যে, তোমার মৃত্যুর জন্য তুমি নিজে দায়ী ; তুমি নিজেই ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করেছ।

—কাগজ দাও, লিখছি।

পকেট হাতড়ে কাগজ আর পেন্সিল বের করে কুমুদ। লিখে দেয় শীলা—হুড্রুর পাগল জল দেখতে বড় সুন্দর। দেখে বড় লোভ হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, সুন্দর মরণ এতদিনে দয়া করে আমাকে ডাক দিয়েছে। কাজেই, থাকতে পারছি না। আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয় ; দায়ী আমি ; আমি খুশি হয়ে নিজের ইচ্ছায় মরছি।

লেখাটা হাতে তুলে নিয়েই কুমুদের চোখ দুটো হেসে ওঠে। হেসে উঠেছে চোর নেকড়ের খুশি অন্তরাত্মা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই হঠাৎ খট্‌কা লেগে কুমুদের চোখে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। এ কি-রকমের অদ্ভুত একটা হাসি কাঁপছে শীলার কালো মুখে ? একটা কৌতুকের হাসি বলেই যে মনে হয়। মতলবটা কি ? তবে কি আত্মহত্যার এমন একটা অঙ্গীকার নিজের হাতে লিখে দিয়েও বেশ খুশি হয়ে বেঁচে থাকবে শীলা ? সাংঘাতিক কুৎসিত একটা ধূর্ততা আজ কুমুদকে শুধু একটা কপট আশ্বাস দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছে ?

—মনে হচ্ছে তুমি একটা তামাশা করছ। বলতে গিয়ে কুমুদের

হতাশা-ভীরু চোখ দুটো যেন ধিকিধিকি আগুনের জ্বালার মত কাঁপতে থাকে।

শীলা—তোমার সঙ্গে তামাশাই করছি।

—কি বললে?

—এত ভয় পেও না। মরবো ঠিকই; কিন্তু তোমার জন্যে নয়।

—তার মানে?

শীলার কালো চোখের তারা দুটো যেন দুটো শাণিত ছুরির মুখের মত চিকচিক করে জ্বলতে থাকে।—তোমাকে ঘেন্না করতে হচ্ছে বলে নয়; একজনের ঘেন্না সহ্য করতে পারবো না বলেই মরতে হচ্ছে।

—সে আবার কে?

—আছে। সে আগেও ছিল।

—সে মূর্খটাকে তবে তুমি আগেই কেন বিয়ে···

—চুপ! অবনীশের মত মানুষের পায়ের জুতো ছুঁতে পেলে তোমার মত বিদ্বান ধন্য হয়ে যাবে।

—ননসেন্স!

—সেন্স এই যে আমি সেই অবনীশের দানের টাকার এঁটো তোমাকে খাইয়েছি; তাই তুমি চারটে বছর বেঁচেছ আর এম-এ পাস করেছো।

—তুমিও তাহলে অবনীশের এঁটো?

—হ্যাঁ।

—তবে তো মনে হচ্ছে, অবনীশের লাথির ভয়ে মরবে বলে ঠিক করেছো?

—না, অবনীশের পায়ের ধুলো কপালে জুটলো না বলে মরে যাচ্ছি।

—খুব ভাল কথা। যে কারণেই হোক, তোমার পক্ষে এখন মরে যাওয়াই ভাল। অপমান থেকে বাঁচতে হলে তোমার মরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

-সে কথা তুমি না বললেও চলবে।

—আর কোন কথা নয়। তুমি সরে যাও। আমাকে দেরি করিয়ে দিও না। তুমি সামনে থাকলে আমার মরতেও গা ঘিনঘিন করবে।

—ঠিক কথা। কুমুদের চোখের হতাশ আগুনটা আশ্বস্ত হয়ে আবার জ্বলতে থাকে। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, হনহন করে হেঁটে তারপর প্রায় দৌড়ে দৌড়ে ছুটে চলে যায় কুমুদ।

নীহার রেবা আর জয়া, কালো পাথরের উপর যেন তিনটে রঙীন পাথর নিথর হয়ে বসে আছে। আকাশ-পাতাল ভেবে-ভেবে আর ভয় পেয়ে-পেয়ে তিনটে হৃৎপিণ্ড যেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শীলাদি কি সত্যিই একটা সর্বনাশের কাণ্ড করে বসে রইল? তা না হলে, এতক্ষণ হয়ে গেল, বিকেল ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণই বা বাকি আছে, তবু শীলাদি ফিরে এল না কেন? হুড্‌রুর সেই ছায়া-ছায়া ভয়ের দুটো হিংস্র হাতের থাবা কি শীলাদিকে সত্যিই গলা টিপে, জ্ঞানহারা করে, আর···। ভাবতে গিয়ে তিনজনেরই বুক কেঁপে ওঠে। নীহারের দুই চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যায়। রেবা হাঁসফাঁস করে, আর জয়া আতঙ্কিতের মত কসমসের জঙ্গলের কাছে উড়ন্ত ফড়িংগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

নীহার বলে—আর দেরি করা উচিত নয় জয়া। অন্তত শ্যামার বাবার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া উচিত।

জয়া বলে—আর একটু দেখে নাও।

রেবা—শীলাদিকে একা রেখে আসাই আমাদের খুব ভুল হয়েছে।

নীহার—ভুল তো হয়েইছে। এখন বিপদ না হলে হয়।

রেবা—বিপদ হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। শীলাদি তো খুব বোকা নয়।

জয়া রাগ করে কথা বলে—তোমাদের তাই ধারণা। কিন্তু আমার মনে হয়, শীলাদির চেয়ে বোকা মেয়ে খুব কমই আছে।

নীহার—তর্ক-টর্ক করতে আমার একটুও ভাল লাগছে না জয়া। কি উপায় করি, তাই বল।

রেবা—শ্যামার বাবাকে খবর দাও।

জয়া—আর পাঁচ মিনিট দেখে নাও।

কেদারবাবুও ওখান থেকে বার বার এদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, আর একটু আশ্চর্যও হয়েছেন। ওরা তো সবসুদ্ধ চারজন ছিল, কিন্তু একজন কোথায় গেল? শুধু তিনজন চুপটি করে, যেন তিনটে নির্জীব মূর্তি হয়ে বসে আছে। এত গান গাইছিল, এত হুটোপাটি করছিল যারা, তারা এত স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? আর, ওদের মধ্যে একজন গেলই বা কোথায়? শখ করে ধারার কাছে গিয়ে জলে নামেনি তো?

—শুনছ? শ্যামার মা-কে যেন একটু উদ্বিগ্ন স্বরে ডাক দিয়ে কথা বলেন কেদারবাবু—মেয়েগুলোর মধ্যে একজন গেল কোথায়?

শ্যামা আর রমা, ব্যস্তভাবে একবার ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে একসঙ্গে বলে—নীহারদি প্রেজেণ্ট; রেবাদি, হ্যাঁ রেবাদি প্রেজেণ্ট; জয়াদিও প্রেজেণ্ট···কিন্তু শুধু শীলাদিই অ্যাবসেণ্ট, বাবা।

—সেরেছে! বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করেন কেদারবাবু।

কিন্তু পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালে আরও উদ্বিগ্ন হতে হয়। বেলা পড়ে গিয়েছে। এদিকে-ওদিকে যত দৃশ্য আর অদৃশ্য পিকনিকের আসরের অন্তরাত্মা উঠি-উঠি করছে। উনুনের ধোঁয়া আর কোথাও দেখা যায় না। কোন সন্দেহ নেই, পাঁঠা সঙ্গে নিয়ে যে পার্টিটা এসেছিল, এতক্ষণে তারা মাংসের ডেকচি মাজতে শুরু

করেছে। গ্রামোফোন বাজছিল যেদিকে, সেদিকে এখন শুধু একটা হল্লা শোনা যায়; বোধহয় তাসের শেষ জুয়ার উল্লাস হৈ-হৈ করে উঠেছে। আর ঐ উঁচুতে শঙ্করবাবুদের সেই তাঁবুটাও আর দেখা যায় না। এতক্ষণে বোধহয় তাঁবু গোটানো হয়ে গিয়েছে।

কেদারবাবুও উঠবেন। কিন্তু ওঠবার আগে, পিকনিকের শেষ অধ্যায়ে জিলিপী দিয়ে এক বাটি চা খাওয়া তাঁর অভ্যাস। এটা দশবছরের ঐতিহ্য। সুতরাং, শুধু এক কেদারবাবুর পিকনিকের আসর থেকে উনুনের ধোঁয়া এখনও উঠছে, জল ফুটছে।

—ওকি? ওকি? ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন কেদারবাবু।—ওরা তিনজন যে এদিকে ছুটে আসছে।

নীহার রেবা আর জয়া, ঝোলাঝুলি আর টিফিন কেরিয়ার হাতে তুলে নিয়ে তিনজনেই আতঙ্কিতের মত ব্যস্তভাবে হেঁটে হেঁটে, আর একেবারে কেদারবাবুর কাছে এসে হাঁপাতে থাকে।

শ্যামার মা—তোমরা চললে বুঝি?

নীহার—না। একজনকে খুঁজে পাচ্ছি না।

চমকে ওঠেন শ্যামার মা।—খুঁজে পাচ্ছি না? তার মানে? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

কেদারবাবু—চান টান করতে এদিকে-ওদিকে গিয়েছিলেন নাকি আপনারা?

রেবা—না। আমরা চান-টান করিনি; তবে এদিকে-ওদিকে বেড়িয়েছি।

কেদারবাবু—তাতেই আপনাদের একজন সঙ্গিনী হারিয়ে গেল?

জয়া—না, ঠিক হারায়নি। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে…

—ভদ্রলোক? চোখ বড় করে চেঁচিয়ে ওঠেন কেদারবাবু।—কোথায় দেখলেন ভদ্রলোক? কেমন ভদ্রলোক?

নীহার—ওদিকে একটা জলের দহের কাছে বসে এক ভদ্রলোক ছবি আঁকছিলেন। শীলাদিও সেখানে বসে…

কেদারবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—শীলাদিও বুঝি সেখানে ছবি আঁকতে বসে গেলেন।

জয়া—না। ভদ্রলোক রাঁধতে জানেন না; শীলাদি তাই রান্না দেখিয়ে দেবার জন্য…

—হুঁ। কেদারবাবুর গলার স্বর গর্‌গর্ করে ওঠে।—এই জন্যে, হুড্‌রু ঝর্ণা দেখবার ছুতো করে কলকাতা থেকে আসা হয়েছে!

শ্যামার মা পাল্টা চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেন।—ছিঃ, মানুষের একটা বিপদের কথা শুনে এভাবে গালমন্দ করতে পারে, সে কি মানুষ?

কেদারবাবু—আমি বলেছিলাম কিনা? এঁদের একটু সাবধান করে দেবার জন্য আমি তোমাকে বলেছিলাম কিনা?

—বলেছিলে তো। আর, আমিও ওদের বলেছি। তাতে কি হলো? এখন মেয়েটা গেল কোথায়, সেটা ভাববে? না, তোমার যত জেদের কথা তুলে তর্ক করবে?

নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু এবার যেন একটু সহানুভূতির স্বরে কথা বলেন—একটা কথা। ভদ্রলোক কি-ভাষায় কথা বলছিলেন?

নীহার—বাংলা।

কেদারবাবু—পোশাক?

জয়া—ট্রাউজার আর শার্ট, গলায় একটা রঙীন টাই।

কেদারবাবু—বয়স?

রেবা—বয়স…, এই ধরুন…কতই বা হবে…মোট কথা…।

কেদারবাবু—আপনাদের শীলাদির সঙ্গে মানায়; এই রকম বয়স বটে কিনা?

—ছি, ছি, তুমি কি ভদ্রলোক ? রুষ্টস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শ্যামার মা।

কেদারবাবু—চুপ কর। আমাকে ফ্যাক্ট জানতে দাও।…হ্যাঁ, ভদ্রলোক যাকে বলছেন আপনারা, তার গায়ের রঙ কিরকম ?

রেবা—ফর্সা বলতে পারেন।

কেদারবাবু—আমি আবার কি বলবো ? আপনারা বলুন।… আচ্ছা, যাকে ভদ্রলোক বলছেন আপনারা, তার ভুরু দুটো খুব ঘন আর কালো ?

নীহার—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্যামার মা—কেন ? এর মানে কি ?

কেদারবাবু—বুঝতে পারা গেল, ছায়া-ছায়া কেউ নয়; একজন ফর্সা ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছেন এঁদের শীলাদি। এবং, সেজন্যেই ভরসা হচ্ছে, এঁদের শীলাদিকে পাওয়া যাবে।

শ্যামার মা—তোমার পায়ে পড়ি, বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে মেয়েটাকে আগে খুঁজে বের কর।

কেদারবাবু—তুমি বাজে উদ্বেগ ছেড়ে দাও।

নীহার, জয়া আর রেবার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু বলেন—আপনারাও বাজে ভয় ছেড়ে দিন।

রেবা বিষণ্ণভাবে বলে—আপনি আমাদের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন, যদি কোন বিপদ-আপদ হয়ে থাকে…।

কেদারবাবু—বিপদ হয়ে থাকলে হয়ে গেছে, তবে শীলাদিকে পাবেন।

—ছিঃ; আবার ভ্রূকুটি করে কেদারবাবুর দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন শ্যামার মা।

খাড়াইটার দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্তভাবে কথা বলেন কেদারবাবু—ওঁরাও দেখছি, কেমন-যেন বেশ চঞ্চল হয়ে নেমে আসছেন।

হ্যাঁ, নেমে আসছেন শঙ্কর আর কুমুদ ; অরুণা আর বরুণা ; ছোট তাঁবুটাকে গুটিয়ে-পাকিয়ে একটা প্রকাণ্ড পোঁটলার মত করে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে একটা ওরাওঁ কুলি, আর সেইসঙ্গে খানসামাও পিছু পিছু আসছে। শঙ্করবাবুর হাতে সেই বাইনকুলার এখন নেই, কুমুদবাবুর হাতে সেই রাইফেলও নেই। অরুণা আর বরুণা, দুই মহিলার চোখেও একটা করুণ আতঙ্কের ছায়া ছমছম করছে।

শঙ্করবাবু হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠেন—দুঃসংবাদ, একটা বিশ্রী দুঃসংবাদ কেদারবাবু।

শ্যামার মা চমকে ওঠেন ; আর নীহার রেবা ও জয়া শ্যামার মা-র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চমকে উঠতে থাকে।

—কী ব্যাপার? কেদারবাবু ব্যস্তভাবে মাথায় কম্ফার্টার জড়াতে থাকেন।

শঙ্করবাবু—এখুনি একবার পুলিস ফাঁড়িতে খবর দিতে হয়। সার্চ করবার একটা ব্যবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

কেদারবাবু—সার্চ?

শঙ্কর—হ্যাঁ। এক মহিলা সুইসাইড করেছেন। জীবন্ত উদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না মনে হয় ; তবে, যাতে অন্তত ডেড বডিটা পাওয়া যায়—।

কেদারবাবু—সুইসাইড করেছে মানে? প্রপাতের জলে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড করেছে?

শঙ্কর—হ্যাঁ।

কেদারবাবু—তবে···তবে তো এখন ভগবানই বলতে পারবেন··· ছি ছি, কি বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল!

শঙ্কর—খুবই বিশ্রী। খুবই দুঃখের।

কেদারবাবু—আমি তো জানি মশাই ; এই দশ বছর ধরে দেখে আসছি ; হুড্রুর সেই ছায়া-ছায়া চেহারার ভয়ানক ক্ষুধাটা প্রতি বছর একটি করে প্রাণ আদায় করে ছাড়বেই।

শঙ্করবাবু—ওসব কুসংস্কারের কথা ছেড়ে দিন ; এখন চলুন সবাই মিলে যদি পুলিসকে বলে-কয়ে একটু ব্যবস্থা করতে পারি।

—আগে এদের একটু শান্ত কর। এরা যে গেল! শ্যামার মা'র আতঙ্কটা যেন আর্তনাদ করে উঠেছে।

—কি হলো? বিচলিত স্বরে প্রশ্ন করেন কেদারবাবু ; আর, তখুনি দেখতে পেয়েই চমকে ওঠেন, নীহার রেবা আর জয়া তিন-জনেই মাথা হেঁট করে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

—তাই তো! কেদারবাবুর কঠোর পরিহাসের বুকটাও যেন এইবার ভয় পেয়ে করুণ হয়ে যায়। তাঁর কথার মধ্যে একটা আতঙ্কের সুরে বেজে উঠেছে।

নীহার জয়া আর রেবার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু বলেন—না না, আপনারা মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন কেন? সুইসাইডের মহিলা যে আপনাদেরই সেই বান্ধবী, এতটা বাড়িয়ে ভাবছেন কেন?

শঙ্করবাবু বলেন—কি ব্যাপার কেদারবাবু? এঁদের কোন বান্ধবী কি···

কেদারবাবু—এঁদের এক বান্ধবীর অবশ্য এখনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ; তবে মনে হয়···

শঙ্কর—এঁদের বান্ধবীর চেহারাটা কেমন? কালো?

নীহার—হ্যাঁ।

শঙ্করবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কুমুদ, শোন তো এঁরা কি বলছেন। আর তুমিও বল তো, কি দেখেছ?

কুমুদ বলে—আমি অনেক চেষ্টা করলাম, তবু মহিলাকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি দৌড় দিয়ে এগিয়ে যেয়ে জায়গাটার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মহিলা জলে ঝাঁপ দিলেন। আমি অবশ্য জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আর সব চেষ্টা করেছি, একঘণ্টা

ধরে ছুটেছি, দৌড়েছি, খুঁজেছি, যদি ধারার কিনারায় কোন পাথরে আটকে গিয়ে, কিংবা ছিটকে গিয়ে কোথাও পড়ে থাকে বডিটা ; কিন্তু কোন ট্রেসই পেলাম না।

বরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে কুমুদের গল্পটা যেন আরও গভীর আক্ষেপে করুণ হয়ে ওঠে।—তোমাকে তো আমি তখনই আমার সন্দেহের কথাটা বলেছিলাম বরুণা। তুমি বোধহয় তখন আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি। মহিলাকে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, যেন একটা রহস্য বলে মনে হয়েছিল।

কেদারবাবু—আপনিও কি মহিলাকে দেখেছিলেন?

বরুণা—হ্যাঁ। তবে মহিলার মনে যে ওরকম কোন সাংঘাতিক উদ্দেশ্য আছে, সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু, উনি সেই মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছিলেন; আর আমার কোন আপত্তি না শুনে তখনই রাইফেল হাতে নিয়ে ছুটেছিলেন।

কুমুদ—মহিলা যদি অন্য কোন বিপদে পড়তেন, কোন ডাকাতের বা বদমাসের হাতে, কিংবা কোন সাংঘাতিক বাঘ-ভালুকের মুখে, তবে অবশ্য আমি আমার রাইফেলের কাজ একবার দেখিয়ে দিতে পারতাম। মহিলার কোন বিপদই ঘটতে দিতাম না। কিন্তু এটা তো নিছক আত্মহত্যা; আমি বাধা দেবার সময়ই পেলাম না।

পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করে আর অদ্ভুত রকমের বেদনার্ত ও বিষণ্ণ স্বরে কথা বলতে থাকে কুমুদ।—মনে হয়, মহিলার জীবনেই কোন রহস্যের ব্যাপার আছে।

—ওটা কি? কিসের লেখা? কুমুদের কাছে এগিয়ে গিয়ে লেখাটার ওপর ঝুঁকে পড়েন কেদারবাবু।

কুমুদ—হঠাৎ চোখে পড়লো, এক জায়গায় পাথর-চাপা দেওয়া এই লেখাটা পড়ে আছে। মহিলা লিখে রেখে গেছেন যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন; এবং তাঁর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী।

লেখাটা হাতে নিয়ে নীহারের কাছে এসে কেদারবাবু ভয়ে-ভয়ে বলেন—এ লেখা নিশ্চয়ই আপনাদের বান্ধবীর হাতের লেখা নয়।

চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে নীহার—এ তো শীলাদির হাতের লেখা।

রেবা আর জয়া শ্যামার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে—এ কি সর্বনাশ হলো, মাসিমা।

বরুণার চোখ দুটো ছলছল ক'রে নীহার রেবা আর জয়ার সেই আর্তনাদ-মুখর ও করুণ তিনটে উতলা মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। আর, শোকার্তের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুমুদ। শঙ্করবাবু হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন। শ্যামা আর রমাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অরুণাও রুমাল তুলে চোখ মুছে নিয়ে আর শঙ্করের দিকে তাকিয়ে যেন একটা করুণ আক্ষেপ চাপতে চেষ্টা করে—কুমুদ যদি আর আধ মিনিট সময়ও পেত, তাহলে একটা মানুষের প্রাণ বোধহয় এভাবে নষ্ট হতে পারতো না।

কুমুদের বুকের ভেতর থেকে যেন একটা উদ্ধত আক্ষেপ ফুলে ফুলে ঠেলে উঠতে থাকে।—নাঃ, দুর্ভাগ্য; আধ মিনিটও সময় পেলাম না। জঙ্গলের বাঘও ওভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে পারবে না, আমি যে ভাবে ছুটেছি। কিন্তু বৃথা, মহিলাকে ধরে ফেলতে পারলাম না।

কেদারবাবু বলেন—আপনাদের সবারই কাছে আমার একটা অনুরোধ; আপনারা সবাই আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে এখানে অপেক্ষা করুন। একটু ভাবুন। তারপর যা হয় একটা কিছু করতেই হবে। পুলিসে যদি খবর দেওয়াই ঠিক হয়, তবে দিতেই হবে।

শঙ্করবাবু বলেন—বেশ তো, একটু ভেবে দেখাই যাক।

শীলার দু'চোখের হাসিটা তবু জ্বলজ্বল করে। যেন ভাগ্যের একটা সুবিচারের বিস্ময়কে দেখতে পেয়েছে শীলা। উঃ, জীবনের

এত চমৎকার একটা সত্য না জেনে মরে গেলে কত বড় ভুল করা হতো। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, খুশি হয়ে মরবার কী সুন্দর সুযোগ এনে দিয়েছে, এই অদৃষ্ট। কুমুদ যদি সত্যিই আজ বুকভরা ভালবাসার উপহার নিয়ে দেখা দিত, শীলার জন্য কাঁদতো, তবে বোধহয় এ জগতের সব আলো-ছায়া ঘেন্না পেয়ে কালো হয়ে যেত। বঞ্চনা যদি বঞ্চিত না হয়, তবে পৃথিবীটা বেঁচে থাকবে কি করে? শীলাকে যদি ভালবাসতো কুমুদ, তবে বুঝতে হতো, ভগবান নেই।

কুমুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে সুন্দরী মহিলা, তাঁর মুখটা মনে পড়লে করুণা হয়। বেচারা বুঝতে পারছে না, শীলার অদৃষ্টের কত বড় একটা অভিশাপকে ভুল করে নিজের প্রাণের উপর চাপিয়ে দিতে চলেছেন ঐ মহিলা। না…ভাবতে বোধহয় ভুল হচ্ছে। শীলার অভিশাপ সে মহিলার জীবনেও অভিশাপ হবে কেন? সে মহিলা তো একটা নিরীহ মানুষের আশাকে চুপে চুপে বিষ খাইয়ে অন্য কারও কাছে আপন হবার জন্য চার বছর ধরে চেষ্টা করেনি। মহিলার ভাগ্য হেসে উঠুক। একটা গল্পে পড়েছিল শীলা, কোন এক পিশাচী স্বভাবের মেয়ে বাসরঘরে ঘুমন্ত স্বামীর মুখে বিষ পুরে দিয়েই পালিয়ে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গিয়ে তার এক চেনা মানুষের হাত ধরেছিল। শীলা নামে যে নারী এখানে শালের ছায়ার কাছে এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে নারীই বা কি কম পিশাচী?

কিন্তু পিশাচীর ভালবাসা ভাঙিয়ে, পিশাচীর দানের টাকা-পয়সায় এম-এ পড়ে আর ভাত খেয়ে যে লোকটা আজ এক সুন্দরী মানবীর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য তৈরি করে নিতে পেরেছে, সে লোকটা খুব ভুল একটা ধারণা নিয়ে চলে যেত, যদি সত্য কথাটা অত স্পষ্ট করে না বলে দিত শীলা। মনে

করেছিল কুমুদ, কুমুদের উপেক্ষার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে শীলা আজ আত্মহত্যা করবে। কি-ভয়ানক একটা মিথ্যেকে সত্য বলে মনে করে চলে যেতো ঐ ভয়ংকর বুদ্ধিমান আত্মাটা। আরও স্পষ্ট করে বলে দিলেই ভাল ছিল, তোমার মত একটা চমৎকার বুদ্ধিমানের জন্য নয়, চমৎকার এক পাগলের জন্যই আজ শীলাকে মরে যেতে হবে। আবোল-তাবোল কথা বলে, ছবি আঁকে, চালে-ডালে মিশিয়ে খিচুড়ি র াঁধতেও জানে না, এক সাহেবের বাগানে মালীর কাজ করে জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখেছে যে, তার চোখের কাছে ধরা দেবার লজ্জা আর বিভীষিকা থেকে চিরকালের মত পালিয়ে যেতে চায় শীলা।

ঠিকই তো, পালিয়ে যেতে হতো না, যদি সে-পাগল আজ তুলি হাতে না নিয়ে সত্যিই ছুরি হাতে নিয়ে শীলার কাছে এগিয়ে আসতো।

শীলার চোখের জ্বলজ্বলে হাসির ছবিটা যেন দুঃসহ একটা আর্তনাদ চাপতে গিয়ে ডুকরে ওঠে। দু'চোখ থেকে যেন ফুটন্ত জলের ধারা উথলে উঠে শীলার কালো মুখটাকে ভাসিয়ে দিয়ে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। উঃ, তাই যে সব চেয়ে ভাল ছিল, যদি তাই হতো। অবনীশ আজ যদি ছুরি চালিয়ে শীলার বঞ্চনাভরা ফুসফুসটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিত, তবে বোধহয় হেসে উঠতে পারতো শীলা। খুশি হয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে, একটা পরম মুক্তি আর সম্মানের আনন্দে অবনীশের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে মরে যেতে পারতো। কিন্তু…অবনীশ যে শীলার এই কুৎসিত মুখের মধ্যে চমৎকার সুন্দরতা দেখতে পেয়েছে। শীলার এই শরীরের ছাঁদের মধ্যে সুন্দর মমতার ছন্দ দেখতে পেয়েছে। যার ভালবাসা আর আশাকে বিষ খাইয়েছে শীলা, সে মানুষ আজ শীলার মুখের ছবি এঁকে ধন্য হতে চেয়েছে। ভাগ্যের কি চমৎকার বিদ্রূপ!

হুড়্রুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাথরে-পাথরে মাথা-ছেঁচা হয়ে, ভেসে গড়িয়ে আর আছড়ে আছড়ে শীলার এই চেহারাটা একটা লাস হয়ে কোথায় কত দূরে গিয়ে কোন্ পাথরে কিংবা গহ্বরে গিয়ে ঠেকে থাকবে, কে জানে। কিন্তু সে লাসের পরিচয় জানতে পুলিসের দেরি হবে না। জানতে পারবে অবনীশও। আরও জানবে, এই কুৎসিত লাসটাই হলো চন্দননগরের পরেশবাবুর ভাইঝির লাস। অবনীশের জীবনের স্বপ্নকে অপমান করে এতদিন ধরে এই পৃথিবীরই এক কোণে লুকিয়েছিল আর বেঁচেছিল। বড় ভাল হয়, অবনীশ যদি শীলার সেই মরা মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে, আর খুশি হয়ে চলে যায়।

কি আশ্চর্য, জীবনে যাকে চোখে দেখেনি অবনীশ, তাকেই নাম ধরে ডাক দিয়েছে। অবনীশের আশার শীলা তো একটা ঢলঢলে সুন্দর মুখ। কিন্তু এই কুৎসিত মুখটাকে তবু শীলা বলে সন্দেহ করে ফেলতে পেরেছে অবনীশ। কি-ভয়ানক চোখ! কিন্তু মানুষটার চোখ ছুটোরই বা কি-ভয়ানক দুর্ভাগ্য। শীলার এই মুখটাকে অবঞ্চনার ছবি বলে মনে হয়েছে। মানুষটার আশার স্বপ্ন বিনা-দোষে ছিন্নভিন্ন হয়ে মানুষটাকে পাগল করে দিয়েছে। নইলে ওর চোখ ছুটো এত বড় ভুল করবে কেন?

হাতের কাছে কাগজ নেই, কলম নেই। নইলে আজ এখনি ছোট্ট একটি স্বীকৃতি লিখে রেখে, আর সেই স্বীকৃতির লেখাটাকে বুকে চেপে আর চুমো খেয়ে এই প্রপাতের জলে ঝাঁপ দিতে পারতো শীলা—ক্ষমা করো না অবনীশ; কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে আজ মনে-প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি বলেই আমি মরে গেলাম।

না, কী দরকার? শীলার মরণের সঙ্গে ও মানুষটার নামটাকে জড়িয়ে দিয়ে যাবার কোন অধিকার শীলার নেই। কোন লাভ হবে না। শীলার পচা লাস মর্গে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিস শুধু বারবার

ঐ মানুষটাকে প্রশ্ন করে করে হয়রান করবে, আপনাকে ভালবাসে যে মেয়ে, সে মেয়ে আত্মহত্যা করে কেন? পুলিসের প্রশ্নটা যে নিরীহ মানুষটাকে ভয়ানক অপমান করবে। মুখে কিছু না বলুক, অন্তত মনে মনে বলবে, কি ভয়ানক হিংস্র তুমি শীলা, বেঁচে থাকতে যাকে ভালবাসতে পারলে না আর এত অপমান করলে, মরে গিয়েও তার ক্ষতি করছ?

দূরের শ্যাওলামাখা পাথরগুলির দিকে তাকিয়ে আর তারই আড়ালের এক মরণ-যমুনার উচ্ছল হর্ষের শব্দের দিকে কান পেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শীলা। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হাসতে থাকে শীলার চোখের তারা। যেন লগ্ন দেখা দিয়েছে; যেন চাঁদ উঠেছে আকাশে; আর, অভিসারিকার প্রাণে আর তর সইছে না। শক্ত করে খোঁপাটা বেঁধে নিয়ে, আর শাড়ির আঁচলটাকেও শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে তৈরি হয় শীলা।

এক পা এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ায় শীলা। পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। কাঁটাটা তুলে নিয়ে আর ফেলে দিয়েই একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। নিয়তির এই লগ্নক্ষণে আর শুভযাত্রার পথে কোন বাধার কাঁটাকে পায়ে বিঁধে থাকতে দেবে কেন শীলা? আজ যে স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে হবে। বিকেলের রোদের লালচে আলো শালের ছায়ার এক ফাঁকে শীলার মুখের উপর পড়েছে। শালের মাথায় একটা কাক ছটফটিয়ে উঠেছে। এগিয়ে যায় শীলা।

—শীলা!

একটা আহ্বানের স্বর। যেন বনভূমির বুকটাকেই শিউরে দিয়ে ছোট্ট একটা আহ্বানের ভাষা শিউরে উঠেছে। ছটফট করে উড়ে পালিয়ে গেল শালের মাথার কাকটা।

কে ডেকেছে? অবনীশ? কিংবা একটা অপার্থিব ছায়া-ছায়া সত্তা শীলাকে এই মরণযাত্রার লগ্নমুহূর্তে ডেকে ফেলেছে?

ডাক শুনে একবার চমকে ওঠে শীলা, কিন্তু তারপর আর নয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় শীলা। আর অপলক চোখ তুলে যেন একটা বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ কেমন আর্টিস্ট? কোথায় গেল সেই আবোল-তাবোল কথার মানুষটা আর স্নিগ্ধ চেহারাটা? কামিজের আস্তিন গোটানো, হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা একটা প্রকাণ্ড ছুরি, আর চোয়াল দুটো যেন বজ্র-পাথরের তৈরি দুটো শক্ত চোয়াল আস্তে আস্তে কাঁপছে; দু'চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝরছে। অবনীশ ডাকে—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক শীলা।

চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল শীলা। কিন্তু শান্ত চোখ দুটো এইবার আবার হাসতে শুরু করে। যেন, একটা বাঞ্ছিত আনন্দের ছবিকে দেখতে পেয়েছে শীলার চোখ। অবনীশের তুলির সামনেও বোধহয় এমন সুন্দর ভঙ্গী ধরে দাঁড়াতে পারতো না শীলা। তুলি দিয়ে কি-ছাই কিসের রূপ আঁকবে অবনীশ? তার চেয়ে এই ছুরি অনেক ভাল। শীলার বঞ্চনাভরা হৃৎপিণ্ডটার সব রক্তের রঙ এখুনি দেখে ফেলতে পারবে। দেখুক অবনীশ।

অবনীশ বলে—লোকটা খুব বেঁচে গেল শীলা।

কিছু বুঝতে পারে না বলেই বোধহয় শীলার চোখের তারা দুটো তেমনই নিশ্চল হয়ে ভেসে থাকে।

অবনীশ বলে—তোমাকে খুন করতে পারতো না লোকটা, বরং নিজেই খুন হতো। আমি যে এখানেই লোকটাকে ঠিক পেছনে, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম।

মাথাটা দুলিয়ে কপালের উপর ছড়িয়ে পড়া একগুচ্ছ চুল হাতের এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে অবনীশ বলে—কিন্তু তুমি লোকটাকে ওসব বাজে কথা কেন লিখে দিলে? ওর সুবিধার জন্য তুমি মরবে, বাঃ, তোমার মাথা যে আমার মাথার চেয়েও খারাপ হয়েছে, দেখছি।

ছুরিটাকে একপাশে ঘাসের উপর ফেলে দিয়ে ঘাসেরই উপর

লুটিয়ে বসে পড়ে অবনীশ ; আর যেন অদ্ভুত এক খুশির পাগলের মত বিড়বিড় করে কথা বলে—আঃ, এমন করেও মানুষের স্বপ্ন সত্যি হয় ! আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, শীলা।

শীলার চোখের তারা দুটোর বোধহয় আর কেঁপে কেঁপে শিউরে ওঠবারও শক্তি নেই। দু'চোখ বন্ধ করে, আর, যেন একটা স্তব্ধ পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শীলা।

অবনীশ বলে—বসো শীলা। আর এখন কিসের ভয় ? আমাদের সৌভাগ্যের ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখ শীলা, কী অদ্ভুত। তোমাকে যে হঠাৎ এভাবে আর এত স্পষ্ট করে পেয়ে যাব···

শীলা দু'হাত তুলে চোখ দুটোকে চেপে ধরে। অবনীশ ব্যস্ত-ভাবে বলে—ওকি ? ওকি ? ছি. ছি ; যখন সব সমস্যা মিটে গিয়েছে, তখন আবার কান্না কিসের ? আমিও তো ওরকম করে অনেক কেঁদেছি···কিন্তু সে-সব তো পুরনো ব্যাপার ; সব ঝঞ্ঝাট চুকে গিয়েছে।

হঠাৎ যেন ডানাভাঙা পাখির মত ছটফটিয়ে বসে পড়ে শীলা, তারপরেই ঘাসের উপর মাথা উপুড় করে দিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

অবনীশ বলে—তুমি ওরকম করো না শীলা ; খুব অন্যায় করা হবে। আমি যখন কোন বাজে কথা ভাবছি না, তুমিই বা তখন কেন যত আজে-বাজে কথা ভাববে ?

শীলা—আপনি আমাকে বাধা দেবেন না।

—কিসের বাধা ?

—আমাকে যেতে দিন।

—কোথায় ? তোমার বান্ধবীদের কাছে ?

উত্তর দেয় না শীলা। আস্তে আস্তে মুখ তুলে অবনীশের সেই মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে, যে মুখটা এখনও অবাধে আবোল-তাবোল কথা বলে চলেছে।

অবনীশ বলে—সত্যি কথা কি জান ? যদি দেখতাম, লোকটা

তোমাকে ভালবাসার কথা বলছে, তবে, বিশ্বাস কর শীলা, আমি চুপ-চাপ চলে যেতাম। তুমি আমাকে দেখতেই পেতে না।

শীলা—এখন তো যেতে পারেন।

—বাঃ, এখন কেন যাব? এখন আর বাধা কোথায়? ও ভদ্রলোক তোমাকে ভালবাসে না; আর, তুমিও ও ভদ্রলোককে ভালবাস না।

—কে বললে?

—কে আর বলবে? তোমার কথা শুনেই বুঝলাম।

—কি বুঝলেন?

—বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। তুমি ভদ্রলোককে ভালবেসেছিলে, ভদ্রলোকও তোমাকে ভালবাসার ভাব দেখিয়েছিল; কিন্তু এখন অন্য একজনকে ভালবেসেছে, এই তো ব্যাপার।

—কিন্তু তার আগে যে-সব ব্যাপার হয়েছে, সে-সব কিছু কি বুঝেছেন?

—কি ব্যাপার?

—আপনি যে টাকা পাঠাতেন, সেই টাকাতে শুধু যে আমি লেখাপড়া শিখেছি, তা নয়, ঐ ভদ্রলোককেও···

—তার মানে?

—তার মানে আমি ভদ্রলোককে যে টাকা দিতাম, সে টাকা আপনারই টাকা।

—তুমি একটা কাণ্ডই করেছিলে শীলা। যাক, এরকম হয়েই থাকে। সে জন্য কিছু মনে করো না।

—আমি না হয় কিছু মনে করছি না। কিন্তু আপনি মনে করতে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

—আমি আবার কি মনে করবো? আমি আশা করে তোমাকে টাকা দিতাম, তুমি আবার নিজের জন্য একটা আশা করে

আর-একজনকে টাকা দিতে। এর মধ্যে আমার তো বলবার কিছু নেই।

—কিন্তু আপনার আশা যে মিথ্যে হলো।

—মিথ্যে ? কেন ? তুমি কি আজও আমাকে ভালবাসতে পারবে না ? না হয় আমার মাথাটা একটু খারাপই হয়েছে।

দু'হাতে অবনীশের মাথাটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে শীলা।

—আমাকে তুমি ক্ষমা করো না, অবনীশ। কখ্‌খনো না, কিছুতেই না। এক ফোঁটা বিশ্বাস করো না।

অবনীশ হাসে—এভাবে মাথা জড়িয়ে ধরে আর আরও পাগল করে দিলে শেষে আমি কিন্তু ক্ষমা-টমা চেয়েই ফেলবো শীলা।

অবনীশের কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলায় শীলা—আমার মত একটা বাজে মেয়ের কাছ থেকে বঞ্চনা পেয়ে তুমি কেন এত ভাবলে, কষ্ট পেলে, আর···

অবনীশ হাসে—আর পাগল হয়ে গেলে! এই তো ?···না শীলা, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার মনে হচ্ছে, আমি এখন··· ।

শীলা—কি ?

অবনীশ—সত্যিই মনে হচ্ছে···আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।

শীলা—নিশ্চয় থাকবে না ; আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না।

অবনীশ—তাহলে এবার স্বীকার কর, আমার চোখ খাঁটি আর্টিস্টের চোখ। তোমাকে যে একটা মমতা, একটা অবঞ্চনা বলে আমার মনে হয়েছিল, সেটা তো প্রমাণিত হয়ে গেল।

শীলা—একটা কথার উত্তর দেবে ?

—বল।

—তোমার তো বিশ্বাস ছিল, আমি দেখতে খুব সুন্দর।

—ছিল কেন ? এখনও আছে।

—না না, ঠিক করে কথা বল।

কয়েক মুহূর্ত কি-যেন ভাবে অবনীশ। তারপরেই যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে হাসতে থাকে।—জার্মানীর প্রিজ্‌ন্‌ ক্যাম্পে একদিন অনেক রাতে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কারণ, স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলাম, চন্দননগরের শীলার মুখটা ঢলঢলে সুন্দর নয়, হতেই পারে না। নিশ্চয় দেখতে অন্যরকমের; তাই লজ্জা পেয়ে কিংবা ভয় পেয়ে আমাকে চিঠি দেয় না। কিন্তু শীলার মুখটা তবে কিরকম? এই কথা ভাবতে ভাবতে···

হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে আবার কি-যেন ভাবতে থাকে অবনীশ। শীলা বলে—কি ভাবছ?

অবনীশ—তখন কি ভেবেছিলাম, সেটা এখন ঠিক ভাবতে পারছি না। যাই হোক, দেশে ফিরে আসবার পর অনেক খোঁজ করেও তোমাকে যখন পেলাম না, তখন মনে হলো, শীলা বোধহয় নেই, কিংবা থেকেও নেই। কিন্তু অনেক ভেবে ভেবেও কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না, ও মেয়ের মুখটা দেখতে কেমন? তখন কোথাও কোন সুন্দর মুখ দেখতে সত্যিই ভয় করতো শীলা।—কিন্তু আজ এই প্রথম তোমাকে দেখতে পেয়েই মনে হয়েছিল, এই মুখ হলো সেই মুখ, যে-মুখ দেখলে ভয় করে না। আর, তোমার এই শরীর হলো সেই মায়ার ছাঁদে গড়া শরীর, যে শরীরের সঙ্গে শাড়ি-টাড়ি জামা-টামাকে একটা আবর্জনার ভার বলে মনে হয়। মার্তিনিয়ে বলতো, মুখের রূপ তবু ছলনা করতে পারে অবনীশ, কিন্তু শরীরের রূপ কখনও না। তোমার শরীরটা যে সত্যিই···যাকে বলে···একটা কান্তিধারা, এই হুড্‌রুর ধারার চেয়েও চমৎকার আনন্দের...।

হাত তুলে অবনীশের মুখটা আস্তে চেপে দিয়ে আর মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে শীলা—চুপ। আমি তোমার ছবি নই অবনীশ।

—কেন?

—আমি তোমার সব।

—অ্যাঁ ?

—আমি যে তোমার স্ত্রী।

স্তব্ধ হয়ে, অনেকক্ষণ ধরে, আর চোখের তারা ছুটোকে অপলক করে শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবনীশ। যেন বারুদের ধোঁয়ার একটা আবরণ ভেদ করে কাউকে দেখবার চেষ্টা করছে একটা আহত সোল্‌জারের ঘরকুনো আত্মার আশা।

শীলা বলে—ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি আমাকে কেন টাকা পাঠাতে ?

বিড়বিড় করে কথা বলে অবনীশ—কেন ?

শীলা—তুমি দেশে ফিরে এলেই যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, কথাটা কি মনে নেই ?

অবনীশের বুকের ভিতরে একটা এলোমেলো নিঃশ্বাস যেন ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করছে। কপালটাকে এক হাতে টিপে ধরে অবনীশ। যেন মাথার ভিতরে একটা বদ্ধ বাষ্পের গুমোট চুরমার হয়ে যাচ্ছে।—শীলা! অদ্ভুতভাবে ডাক দিয়ে শীলার একটা হাত চেপে ধরে অবনীশ।

শীলা—বল ?

অবনীশ—আমার সেই চাকরিটা তো আর নেই। যুদ্ধ থেমে গিয়েছে।

শীলা—তাতে কি হয়েছে ? আমি আছি।

অবনীশ—তাহলে আমি এখন কোথায় যাব ?

শীলা—আমার সঙ্গে যাবে।

অবনীশ উঠে দাঁড়ায়—চল।

এতক্ষণের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা উচিত ছিল। একটি মেয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য প্রপাতের জলে ঝাঁপ দিয়েছে ; তার ভয়ানক ইচ্ছার কথাটা নিজেরই হাতে কাগজে লিখে রেখে

গিয়েছে। সুতরাং, আর ভেবে দেখবার কিংবা বুঝে দেখবারই বা কি আছে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ঘটনার কথাটা পুলিশের কাছে জানিয়ে দেওয়াই উচিত।

কিন্তু কেদারবাবু যেন ইচ্ছা করে সব ব্যস্ততাকে এখানে এই পথের মাঝখানে থামিয়ে রেখেছেন। ভদ্রলোক সত্যিই যেন নিদারুণ একটা আলস্যের প্রাণী। গলায় কম্ফার্টার জড়াতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে, গলার স্বরও অলস; ব্যস্তভাবে একটা কথা বলতে পারেন না। ভদ্রলোকের মনের আতঙ্কটাও যেন হদ্দ কুঁড়ে। ছটফটিয়ে উঠতে পারে না।

এতক্ষণ ধরে কেদারবাবু শুধু বার তিনেক অলসভাবে আস্তে ঘাড়টা ফিরিয়ে আর চোখ তুলে কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়েছেন। আর কুমুদও যেন অসহ একটা অস্বস্তিকে কোনমতে সহ্য করবার জন্য বার তিনেক কেদারবাবুর মুখের দিকে রুক্ষ চোখ তুলে তাকিয়েছে।

কিন্তু আর বোধহয় এভাবে এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী নয় কুমুদ। চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ—এখানে এই ভদ্রলোকের একটা বাজে কথার পরামর্শে আমাদের আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

কেদারবাবু করুণভাবে তাকিয়ে কথা বলেন—তবে কি করলে বেশ ভাল মানে হবে স্যার?

কুমুদ—আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না। কাজেই আপনি অনর্থক আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না।

কেদারবাবু—মিছিমিছি আমার ওপর আপনার এত বিরক্ত হওয়ার কোন মানে হয় না স্যার।

কুমুদ—আমরা চললাম। চলুন শংকরদা।

কেদারবাবু—সেটা সম্ভব নয়; কোনমতেই সম্ভব নয়।

কুমুদ—কেন?

কেদারবাবু—মেয়েটির আত্মহত্যার আপনিই একমাত্র সাক্ষী। আপনি একেবারে সচাক্ষুষ ঘটনাটাকে দেখেছেন। আপনি চলে গেলে চলবে কেন? আপনাকে চলে যেতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই বা হবে কেন?

—কি বললেন? চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ।

—আমার ওপর এত ক্রোধ প্রকাশ করলে আমার ওপর বড়ই অবিচার করা হয় স্যার। বিনীতভাবে আর অতি কোমল স্বরে যেন আবেদন করেন কেদারবাবু।

শংকরবাবু বলেন—আচ্ছা, এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের কথা কাটাকাটির কোন মানে হয় না। এখন আমাদের কাজ হলো…।

কেদারবাবু—আমাদের কাজ হলো, আরও একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা।

—তার মানে? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে কুমুদ।

কেদারবাবু—আপনার এত রাগ করবার কোন মানে হয় না স্যার।

শংকরবাবু বলেন—থামুন থামুন। তুমি চুপ কর কুমুদ।

কেদারবাবু যেন একটু লজ্জিত হয়ে শংকরবাবুর মুখের দিকে তাকালেন—বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই চুপ করে একটু ভাবতে চেষ্টা করছি স্যার।

কি আশ্চর্য, রেবা নীহার আর জয়াও চুপ করে কি-যেন ভাবতে চেষ্টা করছে। তিন জনেই একসঙ্গে তিন জোড়া বিস্ময়ের চক্ষু তুলে কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে কি-যেন আলোচনা করে। মনে হয়; ওদের তিন জনের মনের তিনটি অদ্ভুত বিস্ময় যেন কানাকানি করে কথা বলছে।

কেদারবাবু একবার হাই তোলেন; তার পরেই রেবা জয়া আর

নীহারের কাছে এসে এসে আনমনার মত পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপরেই যেন চমকে ওঠেন কেদারবাবু; কেদারবাবুর মুখের প্রশ্নের ভাষাটাও রেবাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে।—কি? কি? কি যেন বলাবলি করছেন আপনারা।

জয়া বলে—কিছু না।

নীহার বলে—সামান্য একটা কথা, এমন কোন অদ্ভুত কথা নয়।

রেবা বলে—একটা পুরনো কথা।

কেদারবাবু—কিন্তু এত ভয়ে ভয়ে আর এত আস্তে কথা বলছেন কেন আপনারা?

রেবা—ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই জোর করে বলতে পারছি না।

কেদারবাবু—কি?

রেবা—ঐ ভদ্রলোক, যাঁর হাতে বন্দুক রয়েছে···।

কেদারবাবু—কুমুদ যার নাম?

রেবা—হতে পারে। ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের শীলাদির চেনা-শোনা ছিল বলে মনে হচ্ছে।

কেদারবাবুর বুকের ভিতর থেকে যেন প্রচণ্ড একটা কৌতূহলের স্বর উথলে ওঠে।—কি বললেন?

রেবা ফিসফিস করে যেন ভয়াতুর স্বরে কথা বলে।—তার মানে, শীলাদির সঙ্গে যে ভদ্রলোকের চেনা-শোনা ছিল, সে ভদ্রলোককে দেখতে ঠিক এই ভদ্রলোকের মত।

কেদারবাবু—আপনাদের শীলাদির সেই ভদ্রলোকের নামও কি কুমুদ?

জয়া—সেটা বলতে পারছি না। শীলাদি আমাদের কাছে বলেনি।

নীহার—আমরা শুধু একদিন আড়াল থেকে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম।

কেদারবাবু খুব আস্তে কথা বলেন—যাক্‌, যাক্‌, যথেষ্ট। আমার পক্ষে এটুকু জানতে পারাই যথেষ্ট। মনে হচ্ছে, হেঁয়ালিটা যেন একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

রেবা—হেঁয়ালি বলছেন কেন ?

কেদারবাবু আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন।—চমৎকার হেঁয়ালি।

নীহার—চিঠিটা কিন্তু শীলাদির হাতের লেখা। কোন সন্দেহ নেই।

কেদারবাবু—তাই তো বলছি, চমৎকার হেঁয়ালি। আচ্ছা, আপনারাও একটু ভাবুন। আমি ততক্ষণ…।

এগিয়ে যান কেদারবাবু। শংকরবাবুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আর কুমুদের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে কেদারবাবুর চোখের দৃষ্টিটা যেন অলসভাবে দুলতে থাকে। কেদারবাবু বলেন—আমার একটা জিজ্ঞাস্য ছিল ?

শংকরবাবু—বলুন।

কেদারবাবু—বন্দুকের গুলির যে আওয়াজটা সবাই শুনতে পেয়েছে, সেটা কি আমাদের কুমুদবাবুর বন্দুকের গুলির আওয়াজ নয় ?

শংকরবাবু—হ্যাঁ, কুমুদেরই রাইফেলের আওয়াজ। কিন্তু তাতে হয়েছে কি ?

কেদারবাবু—আওয়াজটা কেন হলো স্যার ?

শংকরবাবু জবাব দেবার আগেই বরুণা ভ্রূকটি করে কথা বলে। —একটা হরিয়াল ঘুঘু মারা হয়েছে।

কেদারবাবু—আপনি তো তাই বলবেন ; আমিও বিশ্বাস করতে চাইছি ; কিন্তু লোকে যদি বিশ্বাস না করে…।

কুমুদ—লোকে আপনার মত নয়।

বরুণা—কি আশ্চর্য, এ ভদ্রলোক কি-রকম মিসচিভাস কথাবার্তা শুরু করলেন!

কেদারবাবু—মাপ করবেন, কেন যেন আমার মনটা বারবার মিসচিভাস হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক্, আপনি নিশ্চয় গুলি করে মারা ঘুঘুটাকে দেখেছেন!

বরুণা—দেখেছি বইকি।

কেদারবাবু—যাক্; আমি বিশ্বাস করছি। আপনার কথাকে আমি একটুও সন্দেহ করতে চাই না। কিন্তু…।

শংকরবাবু—আবার কিন্তু কিসের? আপনি উকিলের মত জেরা শুরু করলেন কেন?

কেদারবাবু—আমি একবার আত্মহত্যার চিঠিটাকে একটু ভাল করে দেখতে চাই স্যার।

চিঠিটা শংকররাবুর হাতেই ছিল। চিঠিটাকে কেদারবাবুর চোখের দিকে এগিয়ে দিয়ে অপ্রসন্ন স্বরে কথা বলেন শংকরবাবু—দেখুন, কি দেখতে চাইছেন।

চিঠিটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই কেদারবাবু বলেন—বেশ বেশ, এমন কিছু দেখবার নেই। শুধু জানতে চাই, আমাদের কুমুদবাবুর পকেটে কোন নোটবুক আর সবুজ কালির পেন নেই তো?

চমকে ওঠে বরুণা! চমকে ওঠে কুমুদের চোখ। কুমুদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে বরুণা বিড়বিড় করে।—একটা নোটবুক দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। তোমার পেনের কালিটা তো সবুজ কালি বলেই মনে হচ্ছে।

কেদারবাবু—থাক, থাক, এতেই হবে, আমি শুধু একবার ওঁর নোটবুকটা আর কলমটা দেখতে চাই।

কুমুদের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে বরুণাই ব্যস্তভাবে টেনে বার করে, হ্যাঁ, সত্যিই একটা নোটবুক আর একটা পেন। পেনের কালিও সবুজ।

বরুণার প্রাণটা যেন কেদারবাবুর জঘন্য সন্দেহের নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে ছটফটিয়ে উঠেছে। লোকটা কুমুদের গম্ভীরতাকে কি-ভয়ানক প্রশ্ন দিয়ে জেরা করছে? চেঁচিয়ে ওঠে বরুণা—এই তো নোটবুক, আর এই তো পেন। বলুন, কি বলতে চান আপনি।

নোটবুক আর পেনটাকে হাতে তুলে একবার দেখে নিয়েই কেদারবাবু দুই চোখ বড় করে বরুণার রুষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।—আপনিই বলুন ম্যাডাম, এ কেমন বিচিত্র ব্যাপার? আমাদের কুমুদবাবুর নোটবুকের কাগজটা যেমন রুলটানা, আত্মহত্যার চিঠিটাও তেমনই রুলটানা কাগজে লেখা। চিঠির কাগজের সাইজটাও ঠিক নোটবুকের একটা পাতার সাইজের মত। আত্মহত্যার লেখাটাও সবুজ কালির লেখা। বাঃ, ভগবান এমন চমৎকার মিল কেন যে সৃষ্টি করলেন, তা কে বুঝবে বলুন?

শংকরবাবুর মুখের দিতে তাকিয়ে বরুণার দুই চোখ থরথর করে কাঁপতে থাকে।—আপনি বলুন শংকরদা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কেদারবাবু বলেন—আপনি শান্ত হোন ম্যাডাম। তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। একটু ভেবেচিন্তে বুঝতে চেষ্টা করুন।

কুমুদ বলে—কোন দরকার নেই।

কেদারবাবু—কেন?

কুমুদ—যা বুঝতে হয় তা আমরা নিজেরাই বুঝে নেব। কেন আর কিসের জন্য এরকম ব্যাপার হয়েছে, সেটা আমি জানি।

কেদারবাবু—আমাকেও একটু জানিয়ে দিন না স্যার।

কুমুদ—আপনি কে? আপনাকে জানাতে আমি বাধ্য নই।

কেদারবাবু—আমি কিন্তু জানতে বাধ্য স্যার। পুলিশকেও এসব কথা জানাতে আমি বাধ্য।

কুমুদের চোখের তারা দপ্ করে জ্বলে উঠে।—পুলিশকে জানাবেন?

কেদারবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে কুমুদ।—যাক্, আপনার বেশ গোঁ আছে দেখছি। কিন্তু পুলিশের কাছে এসব কথা বলবার কোন দরকার নেই।

কেদারবাবু—কেন দরকার নেই?

কুমুদ হাসে—আসল ব্যাপারটা আপনি জানেন না, তাই ভাবছেন যে…।

কেদারবাবু—তবে আসল ব্যাপারটাই একটু ভেঙ্গে বলুন, শুনে কৃতার্থ হই।

কুমুদ—ঐ মহিলা আমারই কাছ থেকে কাগজ আর কলম নিয়েছিলেন।

কেদারবাবু—নতুন কথা কেন বলছেন স্যার!

কুমুদ—না, এটাই আসল কথা।

বরুণা ভ্রূকুটি করে।—কি বললে?

কুমুদ হাসে—ঠিকই বলছি। শুধু ইচ্ছে করে ওকথাটা তোমাকে বলিনি; চেপে গিয়েছি। কারণ…।

কেদারবাবু—কি কারণ?

কুমুদ—কারণ এই যে…।

কুমুদের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে কুমুদ। শুধু বরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শংকরবাবু বলেন—লজ্জাটজ্জা না করে তুমি কথাটা একেবারে স্পষ্ট করে বলে দাও কুমুদ। ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। আমারও আর এইসব বিশ্রী কথা-কাটাকাটি ভাল লাগছে না। সত্যি কথা, আমি বেশ উদ্বেগ বোধ করছি।

কুমুদ বলে—কারণ এই যে, বরুণা হয়তো মনে করতো যে, ঐ মহিলার সঙ্গে আমার কোনদিন চেনা-শোনা ছিল; তাই আমি…।

বরুণা—কি ?

কুমুদ—যাতে তোমার মনে কোন বাজে প্রশ্ন দেখা না দেয় ; সেই জন্যেই আমি কথাটা চেপে গিয়েছি। আমি সন্দেহই করতে পারিনি যে, মহিলা এসব ভয়ানক কথা লেখার জন্যেই আমার কাছে কাগজ আর কলম চাইলেন।

বরুণা—তারপর ?

কুমুদ—তারপর আর যা হলো সবই বলেছি, সবই শুনেছ। মহিলা আত্মহত্যার চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

কেদারবাবু—কোথায় গেলেন ?

কুমুদ—প্রপাতের দিকে।

কেদারবাবু আস্তে একটা হাঁফ ছাড়েন।—তাই বলুন।

কুমুদ—অগত্যা, কাজেই, আমার পক্ষে তখন···তার মানে···।

কেদারবাবু—বাস্তবিক, আপনি যথেষ্ট করেছেন। আত্মহত্যার মহিলাটাকে বাধা দেবার জন্যে···।

কুমুদ—হ্যাঁ, বাধা দেবার আর সুযোগই পাওয়া গেল না। যাই হোক, এখন আমাদের কর্তব্য হলো···।

কেদারবাবু—বলুন।

কুমুদ—এসব ব্যাপার নিয়ে আর আমাদের মাথা না ঘামানোই ভাল।

কেদারবাবু—তার মানে ?

কুমুদ—পুলিশকে এবিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। উল্টে আমাদেরই যত হয়রানি ভুগতে হবে। তদন্তের কাছে আর আদালতের কাছে দশবার ছুটোছুটি করতে হবে।

কেদারবাবু—তার চেয়ে ভাল হয় ; যদি···।

কুমুদ—কি ?

কেদারবাবু—যদি আর একটু ভেবে-চিন্তে, আরও একটু বুঝে-সুঝে পুলিশকে খবরটা জানাই, তবে বোধহয়…

কুমুদ ব্যাস্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—শংকরদা, আমি আর এই মিসচিভাস লোকটার কথায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। আপনারা যদি না যান, তবে আমি একাই চলে যাব।

—ছিঃ, কুমুদের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে যেন একটা করুণ অনুযোগ নিক্ষেপ করেন কেদারবাবু।—আমাদের দশজনকে এখানে অসহায় করে ফেলে রেখে আপনার একা-একা চলে যাওয়া কি উচিত হবে স্যার ?

কুমুদ—বাজে কথা রাখুন।

কেদারবাবু—আমরাই বা আপনাকে একা-একা চলে যেতে দেব কেন স্যার ?

কুমুদ—কি বললেন ?

কেদারবাবু—আমি বলি, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। আর একটু ভেবে দেখা যাক।

শংকরবাবু বলেন—তুমি ব্যস্ত হয়ো না কুমুদ। আমার মনে হয়, পুলিশে খবর না দেওয়া উচিত হবে না।

কুমুদ--কিন্তু পুলিশকে কি কথা বলবেন আপনারা ?

কেদারবাবু—সেই কথাটাই তো ভাল করে, একটু তলিয়ে ভাবতে আর বুঝতে হবে স্যার। এত অশান্ত হলে তো চলবে না। এই দেখুন না, ঐ তিন মহিলা, যাঁরা তাঁদের বান্ধবীর নিয়তির কথা শুনে এতক্ষণ কেঁদেছেন, তাঁরাও এখন কেমন শান্ত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

এতক্ষণ কুমুদেরই পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বরুণা ; কুমুদেরই ছায়ার সঙ্গে বরুণার ছায়া মেশামেশি হয়ে শুকনো পাতা ছড়ানো বনপথের উপর শান্তভাবে লুটিয়ে ছিল। কিন্তু মেশামেশি সেই দুই ছায়া এইবার যেন কেঁপে উঠেছে। মেশামেশি ছায়াটা এইবার যেন

দু'ভাগ হয়ে যেতে চাইছে। ছটফট করছে বরুণা। কুমুদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা করছে। বরুণার চোখেও যেন দুঃসহ একটা প্রশ্নের আগুন এই শীতের বিকালের অতিমৃদু ঘনবাতাসের ছোঁয়া লেগে ধিকি-ধিকি করে জ্বলছে।

সত্যিই সরে যায় বরুণা, সরে গিয়ে শংকরবাবু আর অরুণার মাঝখানের ছোট পাথরটার উপর চুপ করে বসে পড়ে। মাথা হেঁট করে নিকটের একটা কন্টিকারীর ঝোপের দিকে অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বরুণার সুন্দর মুখের আভা যেন এরই মধ্যে পুড়ে গিয়ে আর ছাই হয়ে ঝরে পড়েছে। কন্টিকারীর কাঁটাগুলি যেন বরুণার দুই চোখে বিঁধছে। তা না হলে, ওরকম লালচে হয়ে উঠবে কেন বরুণার কালো চোখ!

বরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়াতুর গুঞ্জনের মত স্বরে কথা বলেন অরুণা।—তুই এরকম করছিস কেন? কুমুদ না হয়···।

বরুণা—কি?

অরুণা—একটা সাংঘাতিক বিশ্রী ঘটনার কথা বলতে গিয়ে না হয় দুটো কথা চেপে গিয়েছে। তাতে···।

বরুণা—তাতে মিথ্যা কথাই বলা হলো।

অরুণা—কি বললি?

বরুণা—মিথ্যে কথা। কুমুদ একটি ভয়ানক মিথ্যুক।

অরুণা—ছিঃ, আস্তে কথা বল।

বরুণা—আস্তে কথা বলতে পারি, ঠিকই; কিন্তু আস্তে ভাবতে পারছি না। তোমাদের এই কুমুদের মুখের হাসির শব্দ শুনতে আমার ভয় করছে। আমার আর এখানে এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কাছে এগিয়ে আসেন শংকরবাবু।—কি হলো? কি বলছে বরুণা?

অরুণা—কি হয়েছে, বরুণাই জানে। আমিও আর কিছু ভাবতে পারছি না। আমারও বড় বিশ্রী লাগছে।

শংকরবাবু—আমারও। কিন্তু···।

অরুণা—কি ?

কেদারবাবুর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে শংকরবাবু বলেন—এ ভদ্রলোকের পরামর্শ তুচ্ছ করে চলে যাবার সাহস পাচ্ছি না।

কেদারবাবু যেন নিজেরই মনের একটা ভরসার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠেন।—এখনও বিকেলের আলো মরেনি, এখনও সময় আছে স্যার। অন্তত সন্ধ্যেটা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত বলে মনে করি।

শংকরবাবু আশ্চর্য হন—অপেক্ষা ? কিসের অপেক্ষা ?

কেদারবাবু—এই···অর্থাৎ···রহস্যটার একটা হদিস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা।

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কুমুদ—কিসের রহস্য ?

কেদারবাবু—আপনি একটু শান্ত হয়ে কথা বলুন স্যার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় বরুণা। দেখতে পায়, কুমুদ একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বরুণার চোখে যেন একটা বহ্নি জ্বালা জ্বলতে শুরু করেছে।

অবনীশ বলে—এখানে একটু বসো, শীলা।

এটা হলো সেই জায়গাটা ; সেই কাকচক্ষু জলের ঝিল। দুটো রঙীন পানকৌড়ি এখনও একসঙ্গে ভেসে ভেসে কালো পাথরের শেওলা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। মাছরাঙারা চলে গিয়েছে বলে মনে হয়। পশ্চিমের আকাশের কোলে ক্লান্ত সূর্যের হাসি লালচে হয়ে উঠেছে।

অবনীশ আবার বলে—এখানে একটু বসো শীলা।

শীলা হাসে—আর এখানে কেন ?

অবনীশ হাসে—এ জায়গাটাকে কি জীবনে কখনো ভুলতে পারবে ? আমি তো ভুলতে পারবো না।

শীলার চোখ ছলছল করে। অবনীশ বলে—আসল কথা হলো, আমার ছবি-আঁকার সব সরঞ্জাম এখানে পড়ে আছে। সেগুলো ফেলে রেখে চলে যাওয়া উচিত নয়।

কথা বলে না শীলা। অবনীশই হেসে হেসে বলে—ওসব এখানে ফেলে রেখে চলে গেলে পুলিশের মনে একটা সন্দেহ দেখা দেবে।

শীলা—সন্দেহ ?

অবনীশ—হ্যাঁ, পুলিশ মনে করবে, আর্টিস্টটা নিশ্চয় জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, কিংবা বাঘের পেটে গিয়েছে।...হ্যাঁ, একটা কথা ; ঐ সাংঘাতিক ভদ্রলোক তোমাকে দিয়ে আত্মহত্যার কথা কাগজে লিখিয়ে নিয়ে চলে গেল কেন ? ওর মতলবটা কি ?

শীলা হাসে—ওর বিশ্বাস, আমি সত্যিই আত্মহত্যা করবো।

অবনীশ—তাতে ভদ্রলোকের ভয় কিসের ?

শীলা—কৈফিয়ত দেবার ভয়।

অবনীশ—কার কাছে কৈফিয়ত ?

শীলা—তাকে আজ দেখেছি। এক সুন্দরী মহিলা।

অবনীশ—বুঝলাম না।

শীলা—মহিলাও আমাকে দেখেছেন।

অবনীশ—বুঝলাম তা।

শীলা—কুমুদ যে আমার খোঁজ করবার জন্যে ছুটে এসেছিল, সে ব্যাপার মহিলা নিজের চোখেই দেখেছেন।

অবনীশ—তার মানে...।

শীলা হাসে—তার মানে, কুমুদ ঐ মহিলার কাছে প্রমাণ করতে চায় যে, আমি নিজেই ইচ্ছে করে মরেছি ; আমার মরণের সঙ্গে কুমুদের কোন সম্পর্ক নেই।

অবনীশ—ভদ্রলোক বোধহয় মহিলাকে ভালবাসেন ; আর মহিলাও··· ।

শীলা—তাই তো মনে হয় ।

অবনীশ—ভালই হলো ।

শীলার দুই চোখের দৃষ্টি আরও নিবিড় হয়ে অবনীশের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে ।—একটা কথা বলবে ?

অবনীশ—বল ।

শীলা—আমাকে সত্যিই ঘেন্না করতে পারছো না ?

অবনীশ—বাজে প্রশ্ন । আমি শুধু ভাবছি, এ কি করে সম্ভব হলো ? চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছে বলে যাকে মনে করেছিলাম, তাকে এমন করে পেয়ে যাব, এমন অসম্ভব যে স্বপ্নেও সম্ভব হয় না ।

শীলা—কিন্তু আমি যে ইচ্ছে করেই তোমাকে মিথ্যে করে দিয়েছিলাম ।

অবনীশ হাসে—বেশ করেছিল ।

এদিকে ওদিকে ঘুরে, ছবি আঁকার যত সরঞ্জাম ঝোলাতে ভরতে থাকে অবনীশ । কিন্তু শীলার প্রাণটা যেন এরই মধ্যে আনমনা হয়ে গিয়েছে । ঝিলের কাকচক্ষু জলের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে শীলা । ঝিলের এই জলের বুকের গভীরে যেন একটা কল্লোল ঘুরে বেড়াচ্ছে ; তারই শব্দ শুনতে পেয়েছে শীলা । মনে হয়, এই তো ঠিক জায়গা, যেখানে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে শীলার জীবনের যত ভুলের জ্বালা চিরস্নিগ্ধ বিরাম পেয়ে যাবে ।

নিজেরই হৃৎপিণ্ডটাকে ঘৃণা করতে হচ্ছে । ভালবাসার প্রতীক্ষা নিয়ে নয়, নিতান্ত একটা অপমানময় প্রত্যাখ্যানের আঘাতে বিতাড়িত হয়ে, বড়লোকের বাড়ির ফটক থেকে নিরাশ ভিক্ষুকের মত ফিরে এসে আজ অবনীশের কাছে দাঁড়িয়েছে যে নারী, সে নারীকে শীলাও যে মনে-প্রাণে ক্ষমা করতে পারবে না । অবনীশ ক্ষমা করলেই বা কী ?

না, অবনীশকে বলে দেওয়াই ভাল। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, কিন্তু আমি যে আমাকে ক্ষমা করতে পারছি না। তুমি আমাকে ঘেন্না করতে পারছো না, আমি যে নিজেকে ঘেন্না করেই মরে যেতে চাই। এখানে, এই ঝিলের জলে ডুবে মরে গেলে লাভ আছে। এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারবো যে, তোমার ভালবাসা পেয়েছি।

রেবা জয়া আর নীহার; ওরা কিছুই জানে না। ওরা যদি আজ সব জানতে পারে, আর তোমার পাশে আমাকে দেখতে পায়; তবুও ওদের চোখে একটা ঠাট্টার ছায়া ভেসে উঠবে। ওরাও বলবে, শীলাদি তো বেশ ভাল করেই পাপ করেছে; নিজের গুণে কোন প্রায়শ্চিত্ত করে পাপ কাটাতে পারেনি; নিজের প্রাণের জোরে অবনীশকে ফিরে পায়নি। নিতান্ত একটা দৈবের দয়াতে অবনীশকে পেয়েছে শীলাদি। শেষ পর্যন্ত ভালই হলো; কিন্তু শীলাদির জীবনের এই ভালর মধ্যে কোন গৌরব নেই।

আজ মনে হয়, পরেশকাকার প্রাণটা যেন অবনীশকে ঠকাবার দুঃখটাকে সহ্য করতে না পেরে, আর অবনীশের চোখের সামনে দাঁড়াবার ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই সময় মত সরে পড়েছিল।

ফিরে আসে অবনীশ; ব্যস্তভাবে বলে—চল শীলা।

শীলা বলে—না।

অবনীশ – কি বললে?

শীলা—তুমি যাও। আমি এখন এখানেই কিছুক্ষণ থাকবো।

অবনীশ হাসে—মিছিমিছি এসব কথা বলছো শীলা। আমি যে কখনই তোমাকে এখানে একা রেখে চলে যাব না, এটা তুমি এখনো বুঝতে পারছো না কেন?

শীলা—তুমি ভুল করছো।

অবনীশ—কিসের ভুল?

শীলা—আমাকে বিশ্বাস করা তোমার উচিত নয়।

অবনীশ—যেদিন অবিশ্বাস করতে পারবো, সেদিন অবিশ্বাস করবো। এখন তো ওসব কথার কোন মানে হয় না।

শীলা—না।

দু'হাতে শীলার স্তব্ধ-গম্ভীর শরীরটাকে শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অবনীশ—শীলা। আমাকে জীবনে অনেক ভোগালে, অনেক কষ্ট দিলে ; কিন্তু আর তো উচিত নয়।

শীলার স্তব্ধ চোখ দুটো থরথর করে কাঁপে। অবনীশ বলে—আমি একটু পাগল বলেই তোমাকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছি! কিন্তু তুমি একটুও পাগল হতে পারছো না কেন শীলা ?

অবনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে শীলার চোখের দৃষ্টি যেন একটা স্বপ্নের আবেশের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। অবনীশ হাসে—মরতে চাও ?

শীলা—হ্যাঁ।

অবনীশ—তাতে তোমার কি সুবিধে হবে বল ? কিছুই না। শুধু আমার জীবনে একটা যন্ত্রণা ছেড়ে দিয়ে যাবে, এই তো ?

শীলার চোখ দুটো যেন দুর্বার একটা মূর্ছার আবেশে বন্ধ হয়ে যায়। অবনীশ বলে—তার চেয়ে ভাল হয় না কি, যদি তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পার!

—কি বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে শীলা।

অবনীশ—আমি আর চাকরি-টাকরির ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে পারবো না। পেটের ভাতের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবো না। আমি শুধু তোমার ছবি আঁকবো।

অবনীশের বুকের উপর শীলার মাথাটা অলস হয়ে এলিয়ে পড়ে। কাকচক্ষু জলের ঝিলের গভীরের কল্লোলটা যেন নতুন স্বরে আর নতুন ভাষায় কথা বলছে। শুনতে পাচ্ছে শীলা, বনের বাতাসে যেন একটা ক্ষমার গানের গুঞ্জন ছুটে বেড়াচ্ছে। অবনীশকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই তো তোমার বেঁচে থাকা উচিত

যাকে অনেক ঠকিয়েছ, তাকে এখন একটু লাভ করতে দাও। যাকে অনেক হয়রান করেছ, তাকে একটু শান্তিতে জিরোতে দাও। অবনীশ শুধু ছবি আঁকুক, তুমি অবনীশের শ্রান্তি ক্লান্তি পিপাসার আর ক্ষুধার সব দাবি মিটিয়ে দেবার ভার নাও।

হেসে ওঠে শীলা—আমি বলছিলাম···।

অবনীশ—বল।

শীলা—আমি তো এখন কলকাতায় চলে যাব। কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—যাব।

—কলকাতায় পৌঁছেই একটা মেস খুঁজে নিতে পারবে তো?

—তা পারবো।

—আজে-বাজে কোন মেস হলে কিন্তু চলবে না। টাকার জন্যে চিন্তা করো না।

—বেশ তো, টাকার জন্যে চিন্তা না হয় না-ই করলাম। কিন্তু···

—কি?

—আমি কি চিরকাল মেসেই থাকবো?

শীলা হেসে ফেলে—এবার তো বেশ বুদ্ধি রেখে কথা বলতে পেরেছো।

অবনীশ—সোজা কথাটা স্পষ্ট করে বলছি।

শীলা—মেসে থাকতে হলে বড় জোর এক মাস থাকবো তারপর দেখি করুণাদি কি বলেন?

অবনীশ—করুণাদি কে?

শীলা—আমাদের হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

অবনীশ—তার মানে, করুণাদি বললে তবেই তুমি···।

শীলা—না; আমিই করুণাদিকে বলবো। তারপর তিনি···।

অবনীশ—কি?

শীলা মুখ ঘুরিয়ে যেন দু'চোখের তারার ঝিকিমিকি হাসিটাকে লাজুক করে দিয়ে লুকিয়ে ফেলতে চায়।—তিনিই বলে দিতে পারবেন, কবে আমাকে ছুটি দিতে পারবেন।

অবনীশ—ছুটি কেন?

শীলা হাসে—বিয়ে করতে হলে ছুটি দরকার। তা ছাড়া…।

অবনীশ—বল।

শীলা—হস্টেল থেকে বিদায় নেওয়া দরকার।

অবনীশ—কেন?

শীলা—জান না?

অবনীশ—না।

শীলা—একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবার দরকার।

অবনীশ—কেন?

শীলা—তা'ও জান না?

অবনীশ—ঠিক বুঝতে পারছি না।

শীলা—স্বামীর কাছে থাকা দরকার। তা না হলে…।

অবনীশ—কি?

শীলা—তা না হলে স্বামী ভদ্রলোকের যত্ন হবে কেমন করে? তা না হলে বেচারা স্বামীর জন্যে রেঁধেই বা দেবে কে? টিনের কৌটাতে চাল-ডাল সেদ্ধ করলেই তো…!

অবনীশের চোখের একটা অদ্ভুত হাসি এতক্ষণ ধরে যেন একটা ছল-গম্ভীরতার আড়ালে লুকিয়েছিল। সে হাসি এইবার এক ঝলক উজ্জ্বলতার মত উথলে ওঠে। অবনীশ বলে—বুঝেছি শীলা, আমি আগেই বুঝেছি। তবু তোমার মুখ থেকে শোনবার জন্যে…।

শীলা—কি বললে? ইচ্ছে করে; চালাকি করে…।

—হ্যাঁ, না বোঝবার ভান করে, বোকার মত চোখ করে, বেশ একটু গম্ভীর হয়ে…।

—তুমি সাংঘাতিক···।

—কি ? সাংঘাতিক পাগল ?

—সেয়ানা পাগল।

শীলার হাত ধরে টান দেয় অবনীশ—চল, আর এখানে দেরি করা উচিত নয়। তোমার বান্ধবীরা হয়তো মনে করছে যে, ধূর্ত আর্টিস্টটা ওদের শীলাদিকে এতক্ষণে···।

শীলা—সন্দেহটা তো ভুল সন্দেহ নয়।

অবনীশ—কিন্তু আরও একটু সন্দেহ করা উচিত ছিল।

শীলা—কিসের সন্দেহ ?

অবনীশ—ওঁদের সন্দেহ করা উচিত ছিল যে, বেচারা আর্টিস্টটা এতক্ষণে বোধহয় শীলাদির পাল্লায় পড়ে···।

শীলা হাসে—আমি তো চাই, ওরা এই সন্দেহই করুক।

ঝিলের জলের ওপর বনের ছায়ার রং লালচে হয়ে ভুলছে। রঙীন পানকৌড়ি দুটো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। শীলা বলে—চল।

ছায়াময় বনপথ ধরে এইবার দুজনে বেশ একটু ব্যস্তভাবে হাঁটতে থাকে। যেন এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের স্বপ্নলোকের পথ পার হয়ে বাইরের বাস্তব জগৎটার কাছে পৌঁছে যাবার কর্তব্যটা এইবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন শুধু ভাবতে হচ্ছে, বাইরের এ জগৎটা কত রকমের কত কঠোর সন্দেহ উদ্বেগ আর আতঙ্ক নিয়ে শীলা আর অবনীশের এই সুখী অদৃষ্টটাকে প্রশ্ন করবার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে। কারণ রেবা জয়া আর নীহার আছে। শ্যামা আর রমা আছে; ছোট্ট হলেও ওরাও কি জিজ্ঞেস করতে ছেড়ে দেবে, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন শীলাদি ? এই ভদ্রলোকই বা কে ? শ্যামার মা আর শ্যামার বাবাও কি ভ্রূকুটি করে না তাকিয়ে পারবেন ? তাঁরা হয়তো একেবারে স্পষ্ট করে বলেই ফেলবেন—এই কেলেঙ্কারী করবার জন্যেই বুঝি কলকাতা থেকে হুড্রু দেখতে আসা হয়েছিল ?

শীলা বলে—না, আর এত ভয় করতে পারবো না।

অবনীশ—কিসের ভয় ?

শীলা—কোন কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারবো না। সবারই কাছে সব কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে যাব।

অবনীশ—কি বলবে ?

শীলা—বলবো, যে-মানুষ আমাকে কিনে নিয়েছিল, আমি এতদিনে তারই কাছে এসেছি।

অবনীশ হাসে—সে-মানুষ কি তোমাকে টাকা দিয়ে কিনেছিল ?

শীলা—না !

অবনীশ—তবে ?

শীলা—ভালবাসা দিয়ে।

শীলার একটা হাত সাগ্রহে বুকের কাছে তুলে নিয়ে কথা বলে অবনীশ।—খুব সত্যি কথা। কিন্তু আমাকে কেউ প্রশ্ন করলে কি বলবো ?

শীলা—তুমি বলবে, যে মেয়ে তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিল, তোমার ভালবাসার অপমান করেছিল, শেষে তুমিই এসে তার হাত ধরেছ।

অবনীশ—এত মিথ্যে বলতে পারবো না।

শীলা—মিথ্যে যে নয়, সেটা তুমিও জান।

অবনীশ—কিন্তু……।

শীলা—কি ?

অবনীশ—ভালবাসার মধ্যে একটু ভুল-টুল থাকাই ভাল। তা না হলে ভালবাসার স্বাদ পাওয়া যায় না।

অবনীশের কথাটা যেন শীলার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে গিয়ে একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে ; চম্‌কে ওঠে শীলা। শীলার চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তিময় নিবিড়তা থমথম করে। সত্যিই যে এই মুহূর্তের নিঃশ্বাসগুলি, এই বুকটা আর মনটা, অদ্ভুত এক স্বাদে ও সৌরভে ভরে-যাওয়া এই শরীরটাও বলছে, ভুল করেছিলে বলেই

তো ভালবাসাকে আজ এত মধুর বলে মনে হচ্ছে। সাজ লাজের সব আবরণ সরিয়ে ফেলে এই বনপথের বিকেলের আলোতেই, আর চোখ বন্ধ না করে অবনীশ নামে এই আর্টিস্ট মানুষটার বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শীলা। অবনীশের হাতটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।—থাম।

শীলার জীবনের ভুলের ক্ষতটা কি নতুন আশায় পাগল হয়ে উঠলো? কিংবা, শীলার নিঃশ্বাসে একটা কৃতজ্ঞতার পিপাসা উতলা হয়ে উঠেছে? করুণাদি কবে দিন ঠিক করবেন, তার অপেক্ষায় থাকলেও আজ এখন এই মুহূর্তে একটা নতুন ভুল করে জীবনের গোপন-করা সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলতে আর নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে দোষ কি?

অবনীশ বলে—বাঃ কী চমৎকার কসমস ফুটেছে!

হেসে ওঠে শীলা—কোথায়?

অবনীশ—ঐ যে, ওদিকে ঐ উঁচুতে; একটা মস্তবড় পাথর আর গাছের ছায়ার মাঝখানে…।

না, এটা সত্যিই স্বপ্নলোকের গহন বন নয়, এটা বাস্তবতার জগৎ। অবনীশের হাত ছেড়ে দেয় শীলা—কিন্তু ওরা কোথায়? ওদের কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

অবনীশ বলে—আছে নিশ্চয়, হয়তো এখানেই কাছাকাছি কোথাও বসে আছে।

শীলা—চল।

অবনীশ—চল।

কি আশ্চর্য, এই বিষণ্ণ করুণ ও শোকাতুর পরিবেশের মধ্যে থেকেও কেদারবাবু যেন নির্লিপ্ত। কেদারবাবুর মুখে কোন করুণতা কিংবা চোখে কোন আতঙ্ক আর নেই। বেশ জোরে জোরে গলা কেশে বুকটাকে হাল্কা করে দিচ্ছেন কেদারবাবু।

সব চেয়ে আশ্চর্য, এবং শ্যামার মা দেখতে পেয়ে যেন দুঃসহ লজ্জায় ছটফটিয়ে ওঠেন, কেদারবাবু এক হাতে চায়ের বাটি, আর, আর এক হাতে জিলিপী তুলে নিলেন।

জিলিপীতে কামড় দিলেন, চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন কেদার-বাবু। তার পরেই গলা কেশে নিয়ে কথা বললেন—একটা ফ্যাক্ট বোঝা গেল, সেই ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেনি।

ভ্রূকুটি করে কেদারবাবুর দিকে তাকায় কুমুদ—ভদ্রলোক! ভদ্রলোক আবার কে?

কেদারবাবু—আজ্ঞে স্যার, ঐ মহিলার সঙ্গে এক ভদ্রলোক আছেন।

কুমুদ—ননসেন্স! কোন ভদ্রলোক নেই; আমি মহিলাকে ছাড়া আর কোন লোককে সেখানে দেখতে পাইনি।

কেদারবাবু—আহা! আপনি আবার কেন এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন?

কুমুদ—আপনি পাগলের মত কথা বলছেন বলেই উত্তেজিত হতে হচ্ছে।

কেদারবাবু—পাগলের কথা শুনে উত্তেজিত হওয়া তো অপাগলের লক্ষণ নয় স্যার।

কুমুদ—দেখলেন তো শংকরদা, এ ভদ্রলোকের কথাবার্তায় ব্যালেন্স বলে কোন পদার্থ নেই। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম···

কেদারবাবু জিলিপীতে আর-একটা কামড় বসিয়ে হাসতে চেষ্টা করেন—আমাকে দেখে ওরকম সন্দেহ হয় স্যার, শ্যামার মা-ও আমাকে প্রথমে দেখে সেই সন্দেহ করেছিল। কিন্তু···

কুমুদ যেন একটা হুংকার চাপতে চেষ্টা করে—কিন্তু কি?

কেদারবাবু—আমি তা নই স্যার। মোট কথা হলো, সেই ভদ্রলোকের ট্রেস না পাওয়া পর্যন্ত মহিলার আত্মহত্যাটাকে একটা

ফ্যাক্ট বলে মেনে নিতে আমি পারবো না। আমি দশ বছর ধরে এই হুড্‌রুতে প্রতি বছর পিকনিক করে আসছি স্যার। আমিও…শ্যামার মা যদি এক্সকিউজ করে…তবে বলতে পারি… একবার ওরকম চিঠি লিখে আত্মহত্যা খেলেছিলাম, শ্যামার মা-কে একটু বৈধব্যের টেস্ট পাইয়ে দেবার জন্যে।

শংকরবাবু বলেন—থামুন মশাই; আপনার রসিকতা এ সময় উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কেদারবাবু—আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার; আপনার পক্ষে বিরক্ত হওয়াই উচিত। আপনার সাদা মনে কাদা নেই; তাই আপনার পক্ষে এসব আজে-বাজে কথা খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু ইনি কেন এত রাগ করে কথা বলছেন, সেটা আপনি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন কি স্যার?

শংকরবাবু বলেন—সত্যি কুমুদ, তুমি এরকম অদ্ভুতরকমের মেজাজ করে কথা বলছো কেন? এটা একটুও শোভন হচ্ছে না।

কেদারবাবু—তা ছাড়া, উনি আর যে-সব কথা বললেন, সেগুলোও নিছক গল্প কিনা, সেটাও একটু বুঝে দেখা দরকার।

কুমুদ—কি বললেন?

কেদারবাবু—ঐ যে, আপনি বললেন, আপনি আত্মহত্যার মহিলাকে ধরবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, ছুটেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যিই ছুটেছিলেন তো স্যার?

কুমুদের চোখের তারা দুটো হঠাৎ সুস্থির হয়ে যায়। কেদার-বাবুর প্রশ্নটা যেন ভয়ানক একটা ধূর্ত প্রগল্‌ভতার আবদার। কুমুদের অদৃষ্টটাকে যেন জেরা করেছে কেদারবাবু নামে এই দেখতে হাবা-গবা অথচ ভয়ানক বাচাল লোকটা। কুমুদ যেন একটা উত্তর দেবার শক্তি পাওয়ার জন্যেই সিগারেট ধরায়। তারপরেই, সত্যিই বোধহয় শক্তি পেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। আর, বরুণার দিকে তাকিয়ে উচ্ছল স্বরে বলতে থাকে—ওগুলো অবশ্য আমার

ইচ্ছে করে তৈরী একটা রসিকতার গল্প। বরুণাকে একটু আশ্চর্য করে দিয়ে মজা দেখবার জন্যেই বলেছিলাম। মহিলা কখন ডুবলো আর মরলো সেটা দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয় নি।

পাথরটার উপরে বরুণা যেন একটা পাথর হয়ে বসে আছে। কুমুদের উচ্ছল হাসির শব্দ দিয়ে তরল করা এই রসিকতার কৈফিয়তটাকেও যেন কানে শুনতে পায়নি বরুণা।

কেদারবাবু বলেন—তাহলে মনে হচ্ছে, মহিলা আত্মহত্যা করেন নি। তিনিও আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছেন।

কুমুদ—রসিকতার কোন ধার-টার ধারে না সে মহিলা। সে এক ভয়ানক একরোখা মেয়েলোক; সে যে আত্মহত্যা করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে মেয়ে কথার নড়চড় করবার মত মানুষ নয়।

শংকরবাবু আশ্চর্য হয়ে কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কুমুদ কি স্বপ্নের ঘোরে, কিংবা একটা জ্বরবিকারের ঘোরে কথা বলছে? আত্মহত্যার সেই মহিলার সব মনস্তত্ত্ব যেন কুমুদের কাছে অনেককালের জানা একটা সত্য।

কেদারবাবু বিনীত ভঙ্গীতে হাসলেন।—মহিলার মনটাকে আপনি এত ভাল করে চিনলেন কেমন করে স্যার? কবে চিনলেন?

চমকে ওঠে কুমুদ। কুমুদের হাসিটাও চমকে উঠে অদ্ভুত স্বরে কাঁপতে থাকে।—আমি চিনি না। আজ একটা দুর্ভাগ্য হলো বলেই, মহিলার মুখের ভাবের রকমসকম চোখে পড়তেই মনে হলো যে, মহিলা ঠিক সুস্থ স্বভাবের মানুষ নয়। খুব সম্ভব কোন কেলেঙ্কারী করে লোকলজ্জা এড়াবার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে।

কেদারবাবু—কেলেঙ্কারী করলেই কি আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হয়?

কুমুদ—আপনার মত মানুষের যে ইচ্ছে হবে না ঠিকই; কিন্তু যার লোকলজ্জার ভয় আছে, তার ইচ্ছে হবে।

কেদারবাবু—আপনি সত্যিই একটা খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। শ্যামার মা জানেন, আমার লোকলজ্জার ভয় থাকলে বাসরঘরেই আফিম গিলতাম। কারণ, বাসরঘরে গান গাইবার জন্য তিনিও উপস্থিত ছিলেন, কৈলাস দারোগার থার্ড ডটার সুমোহিনী, যাকে বিয়ে করবার জন্য আমি কত কবিতাই না লিখেছিলাম।

শংকরবাবু হেসে ফেলেন—থামুন।

কেদারবাবু—এখন আর থামা না থামার প্রশ্ন নেই স্যার। কিন্তু সেদিন সেই বাসরঘরেই শ্যামার মা'র কাছে ধরা পড়ে গিয়ে থেমে যেতে হয়েছিল।

শংকরবাবু—কি হয়েছিল ?

কেদারবাবু—কোন্ এক উদারবতী মহিলা শ্যামার মা'র ঘোমটার কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে কথাটা বলে দিয়ে গেল।

শংকরবাবু—কি বলে দিয়ে গেল ?

কেদারবাবু—ঐ সুমোহিনীর কথা, যার জন্যে আমি···হেঁ হেঁ···। তবু তো আমি আত্মহত্যা করিনি স্যার।

শংকরবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আর যেন আনমনার মত বিড়বিড় করে।—যাক্‌গে, আপনার এসব গল্প এখন কারও ভাল লাগবে না।

কেদারবাবু দেখতে পান, শ্যামার মা তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। আর, কলকাতার মেয়ে তিনটিও বেশ গম্ভীর আর ভীরু-ভীরু চোখ উদাস করে দিয়ে বসে আছে।

কেদারবাবু বলেন—আমার মনে হচ্ছে, আপনারা সবাই আমাকে সন্দেহ করছেন। ভাবছেন, এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনার দুঃখের মধ্যে লোকটা এরকম ফষ্টিনষ্টি করছে কেন ? সত্যি কি না ?

শংকরবাবু বলেন—মিথ্যে নয়। আপনি কিন্তু কোন সুপরামর্শ এখনো দিতে পারছেন না।

কেদারবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন।—সুপরামর্শ আর না দিলেও চলবে স্যার।

শংকরবাবু—থামুন। চেঁচাবেন না।

কেদারবাবু হঠাৎ একগাল হেসে আর মাথা তুলিয়ে যেন দু'খানা হয়ে যান।—তাহলে ওদিক পানে একবার লক্ষ্য করুন স্যার।

—কোন্ দিকে?

—ঐ দিকে।

ঠিক ঐ কসমসের ছোট্ট জঙ্গলটার দিকে, যেখানে একগাদা শিশু গাছের ছায়া এখন বেশ কালো হয়ে এসেছে, সেদিক থেকে একসঙ্গে হেঁটে আর ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছে দুটি মূর্তি, এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা।

নীহার রেবা জয়া, শ্যামা আর রমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—শীলাদি। শীলাদি!

কেদারবাবু একেবারে কুমুদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেন প্রচণ্ড ধূর্ত একটা বিদ্রূপের শান্ত-সংযত হাসি দিয়ে চোখ-মুখ ভরে নিয়ে শুধু কুমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বরুণার দু'চোখে যেন একটা বিদ্যুতের জ্বালা এইবার দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। পাথরটার উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, আর মুখ ঘুরিয়ে কুমুদকে দেখছে বরুণা। যেন একটা ক্ষমাহীন জিজ্ঞাসা তাকিয়ে আছে।

কেদারবাবু মাথা দোলাতে থাকেন—এ তো বড় চমৎকার ম্যাজিক স্যার! যে মহিলা প্রপাতের জলে মরণ-ঝাঁপ দিলেন, সে মহিলা দিব্যি শুকনো চেহারাটি নিয়ে আর গটগট করে হেঁটে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। জামা-কাপড়ের একটা সুতোও ভিজেছে বলে মনে হচ্ছে না। অ্যাঁ?

নীহার বলে—খুব ভয় পেয়েছিলাম বলে, একটা কথা আমরা এতক্ষণ বলতে পারিনি।

শংকরবাবু—কি কথা ?

রেবা আর জয়া একসঙ্গে বলে ওঠে—উনি শীলাদিকে চেনেন।

—কে ? কে আপনাদের শীলাদিকে চেনেন ? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বরুণা।

নীহার কুমুদকে দেখিয়ে দিয়ে বলে—উনি মনে হচ্ছে, উনিই তিনি।

বরুণা—কবে থেকে চেনেন ?

রেবা আর জয়া—তিন চার পাঁচ বছর বোধহয়।

নীহার—শীলাদি টাকা দিতেন বলেই উনি এম-এ পড়তে পেরেছিলেন আর মেসের খরচ চালিয়েছিলেন।

বরুণা—আর কি জানেন বলুন ?

নীহার—আমাদের কেন জিজ্ঞেসা করছেন। ওঁকেই জিজ্ঞেসা করুন।

বরুণা—শীলাদির সঙ্গে এঁর বিয়ের কথা ছিল না ?

নীহার—ছিল বলেই তো শুনেছিলাম।

অবনীশ আর শীলা দু'জনেই কেদারবাবুর পিকনিকের আসরের কাছে এসে হাসতে থাকে।

শ্যামার মা রাগ করে কথা বলেন—তুমি এ কি-রকমের কাণ্ড করলে গো মেয়ে ? কিসের জন্য মিছিমিছি আত্মহত্যার কথা লিখে কার সঙ্গে খেলা করলে ?

অবনীশকে দেখিয়ে দিয়ে শীলা বলে—এর সঙ্গে।

শ্যামার মা চোখ বড় করে তাকান—সে কি ? এ আবার কেমন কথা ?

শীলা হাসে—অনেকদিনের কথা মাসিমা। অবনীশ আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে, তবে আমি লেখা-পড়া শিখেছি। শুধু তাই কেন, ভাত খেতে পেয়ে বেঁচেছি।

শ্যামার মা—কেন ? অবনীশ তোমাকে টাকা দিত কেন ?

শীলা হাসে—ওকেই তবে জিজ্ঞেসা করুন।

অবনীশ নিজেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।—হঠাৎ যুদ্ধে চলে যেতে হলো বলে বিয়েটা হতে পারেনি। তা না হলে অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে যেত।

শীলার দিকে তাকিয়ে আর গলার স্বর চেপে কথা বলেন কেদার-বাবু—জলে নেমেছিলে ?

শীলা হাসে—হ্যাঁ।

কেদারবাবু মাথা নাড়েন।—বোঝ এবার ; ডুবতে হলো কিনা ?

শীলা বলে—হ্যাঁ।

শ্যামার মা ভ্রূকুটি করে চেঁচিয়ে ওঠেন—ছিঃ, বাপের বয়সী একটা মানুষ হয়েও মেয়েটার সঙ্গে তুমি এসব কি কথা বলছো ? হাড়ে-মাংসে লজ্জা বলে কোন বস্তু নেই ?

নীহার রেবা আর জয়া, তিনটে হতভম্ব বিস্ময় যেন একটা রূপকথা শুনছে। শীলাদি আজ যেন একটা ভয়ানক লজ্জাহীন মুখরতা ; শীলাদির চোখ ছুটোকে এভাবে জ্বলজ্বল করতে কোনদিন দেখেনি নীহার জয়া আর রেবা।

কেদারবাবুর গলা এইবার যেন ছুরন্ত একটা আহ্লাদ চাপতে গিয়ে ঘড়ঘড় করে।—তা হলে ফ্যাক্ট হলো, এবার তোমাদের বিয়ে হবে।

অবনীশ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেদারবাবু—নেমন্তন্নটা তাহলে প্রাপ্য রইল।

অবনীশ—নিশ্চয়।

কেদারবাবু—অদ্য তাহলে এইস্থানে বেদব্যাসের বিশ্রাম। এবার তাহলে আসর ভঙ্গ হোক, রওনা হওয়া যাক।

চেঁচিয়ে ওঠে বরুণা—শংকরদা !

শংকর বিব্রতভাবে বলে—কি ?

বরুণা—এই লোকটি যদি আপনাদের সঙ্গে থাকে, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব না।

শংকরবাবু—অ্যাঁ ?

অরুণা—তুই এখন চুপ করে থাক, বরুণা।

বরুণা—না। তা হয় না। অসম্ভব।

শংকরবাবু—বেশ তো, চল আমরা তিনজন এগিয়ে যাই।

শংকর অরুণা আর বরুণা এগিয়ে যায়।

কেদারবাবু বলেন—আচ্ছা, এবার তোমরা দু'জন এগিয়ে যাও।

শীলা আর অবনীশ রওনা হয়।

কেদারবাবু বলেন—এবার তোমরা তিন বান্ধবী যাও।

নীহার রেবা আর জয়া হেসে হেসে চলতে থাকে।

কেদারবাবু—শ্যামা আর রমা, পরেশ আর নরেশ, এবার তোমরা চলতে থাক।

এইবার শ্যামার মা-র দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু বলেন—চল, এবার আমরা দু'জন।

দু'পা এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ান কেদারবাবু। কুমুদের স্তব্ধ নীরব ও নিথর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলেন—বুড়ো মানুষের সামান্য একটা অনুরোধ তুচ্ছ করে হরিয়াল শিকার করা আপনার খুবই ভুল হয়েছে স্যার। দেখলেন তো, হুড্রুর ডাইন আপনার মং অফিসারকেও ছেড়ে কথা কয় না। তাছাড়া…

শ্যামার মা এগিয়ে গিয়েছেন। কেদারবাবুও দু'পা এগিয়ে যেয়েই আবার থমকে দাঁড়ান। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন—তা ছাড়া, আমারও একটা দুর্নাম আছে স্যার। গোবর্ধনবাবু বলেন, আমিই নাকি এই হুড্রুর সেই ছায়া-ছায়া চেহারার ইয়েটা।